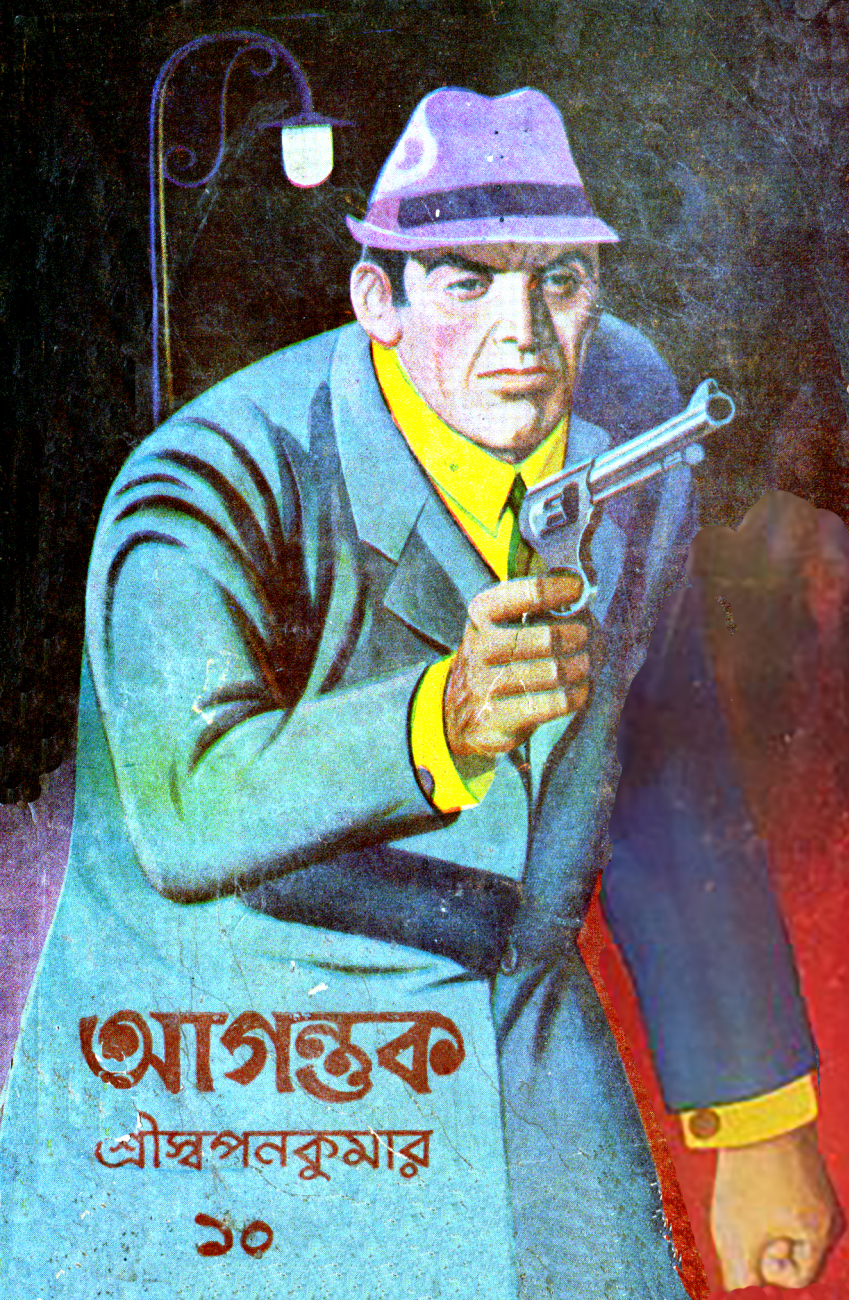

আগন্তুক

শ্রীস্বপনকুমার

১০

ক্রাইম ওয়ার্লড সিরিজ—১০

অনেস্টেক

শ্রীস্বপন কুমার

মূল্য : দুই টাকা

প্রকাশক :
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত
প্রকাশনশ্রী
৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মুদ্রক :
শ্রীচন্দ্রশেখর দে
শ্রীকমলা প্রেস
২৭সি, কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

পুনর্মুদ্রণ : ১৩৮১

রহস্য রোমাঞ্চ সাহিত্যে অভিনব অভিযান।
বর্তমান বাংলার শ্রেষ্ঠ রহস্য ঔপন্যাসিক

শ্রীস্বপনকুমার রচিত

—ক্রাইম ওয়ার্লড সিরিজ—

১। অপরাধী
২। কে তুমি ?
৩। জিঘাংসা
৪। বিশ বছর পরে
৫। কালোছায়া
৬। বিচারক
৭। ন্যায়দণ্ড
৮। অন্তরাল
৯। কার পাপে ?
১০। আগন্তুক

●

প্রতিটি ২.০০

এর পরে আরও বের হতে থাকবে

—ঃ পরিবেশক ঃ—

রাধা পুস্তকালয়

৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

॥ এক ॥

—জরুরী আহ্বান

ঝরঝরে সুন্দর সকাল।

খ্যাতনামা প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ দীপক চ্যাটার্জী রোজকার অভ্যাসমত ঘুম থেকে উঠে খবরের কাগজের পাতায় চোখ বুলিয়ে চলেছিল।

ভজুয়া চা দিয়ে গেল।

চা খেতে খেতে কাগজের ছোট-বড় সব খবর দেখে চলল দীপক।

হঠাৎ একটা খবরের প্রতি আকৃষ্ট হলো তার দৃষ্টি।

কাগজে ছাপা হয়েছিল :

ভারতের বুকে বিরাট গুপ্তচর-চক্রের ক্রিয়াকলাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি!

ভারত সরকারের মুল্যবান কাগজপত্র চুরি!

চোর এখনো ধরা পড়েনি। পুলিশের জোর তদন্ত চলছে!!

খবরটা থেকে মুখ তুলল দীপক।

এরকম ঘটনা অবশ্য আগেও দু'একটা ঘটেছে। তাই খুব বেশি চিন্তিত হলো না সে।

একটু পরে—

রতনলাল ঘরে প্রবেশ করল। তার হাতে সেদিনের ডাকে আসা সব চিঠিপত্র।

রতন দীপককে বললে—কি খবর রে? নতুন কোনও খবর আ নাকি?

দীপক বললে—খবর ত সব সেই পুরনো। তবে ইদানীং গুপ্তচর-চক্রের ক্রিয়াকলাপ খুব বেড়ে গেছে তা দেখতে পাচ্ছি।

—তা ত বটেই। আমিও পড়েছি।

দীপক চিঠিগুলো খুলে এক এক করে পড়তে লাগল।

সব সাধারণ চিঠিপত্র। ভদ্রতা বিনিময়, বন্ধুত্বপূর্ণ চিঠি, আত্মীয়ের চিঠি প্রভৃতি।

একটা চিঠি পড়ে দীপক একটু আশ্চর্য হয়ে গেল।

তাতে লেখা :

মাননীয় রহস্য-সন্ধানী দীপক চ্যাটার্জী

সমীপেষু—

আমি জানি যে, আপনি ভারতবিখ্যাত একজন ক্রিমিন্যালদের শত্রু।

কিন্তু আমি আপনাকে বন্ধু মনে করি। তার কারণও অবশ্য আছে।

আপনার মত মেধাবী রহস্য অনুসন্ধানী ভারতে আর কেউ নেই। তাই আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি।

কিন্তু একটা কথা—

তা হলো, আপনি যে কেন দিনের পর দিন এভাবে পরিশ্রম করে চলেছেন তা জানি না। যদি আপনি পরিশ্রম না করেন তাহলে ঘরে বসে মাসে চার-পাঁচ হাজার টাকা পেতে পারেন।

আমি কে তা জেনে আপনার লাভ নেই। আমার নাম হলো ০৭৫। এই নামেই আমাকে আপনি সম্বোধন করবেন।

আমি চাই যে, আমার দলের পেছনে না লেগে আপনি ঘরে বসে মোটা টাকা উপার্জন করুন।

ইতি—

২৩৫।

দীপক চিঠিটা পড়ল।

বার-বার পড়ল সে চিঠিখানা।

আশ্চর্য পত্র!

জীবনে এমন চিঠি সে কখনো দেখেনি। তার কারণ এক্ষেত্রে একটা নম্বর দিয়ে লোকটি নিজের পরিচয় দিচ্ছে।

দীপক চিঠিটা উল্টে-পাল্টে দেখে রেখে দিল ড্রয়ারে।

এমন সময় ফোন বেজে উঠল ঘন ঘন।

দীপক রিসিভার তুলল।

—হ্যালো—কে?

—আমি মিঃ গুপ্ত।

—আপনি? কি ব্যাপার?

—ব্যাপার খুব সামান্য। আমি চাই যে, আপনি বর্তমানে কোলকাতার বুকে ঘটে-যাওয়া দু' তিনটে কেসের সমাধান করেন।

—তার মানে?

—মানে কোলকাতা শহরে বর্তমানে যে খুন-ডাকাতি হচ্ছে তা কি আপনি জানেন? সে এক ভয়ংকর কাণ্ড।

—না, জানি না।

—কেন?

—তার কারণ আমি এ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় পাই না।

—সে কি কথা?

—ঠিকই বলছি। তবে আপনি যখন ফোন করছেন তখন নিশ্চয়ই এটা একটা বিরাট সমস্যা।

—তা তো বটেই।

—তবে কাল বিকেলে আমার সঙ্গে একবার দেখা করুন মিঃ গুপ্ত

—আমি আসব কি আপনার বাড়িতে?

—হ্যাঁ, কারণ আমি যে এখন ড্রাগনের কেস নিয়ে খুব ব্যস্ত তা আপনি জানেন ?*

—তা জানি।

—তাহলে আসবেন ত ?

—একটু অসুবিধা আছে। বরন আপনি—এলেই ভাল হয়। যুক্তি আছে কয়েকটা কেসের ব্যাপারে।

—আচ্ছা, আমি যাব। কিন্তু আপনি এলে ক্ষতি কি ছিল ?

—ক্ষতি নয়। সবগুলো কেসের রেকর্ড আছে এখানে। সেগুলো আমরা ত লালবাজার থেকে নিয়ে যেতে পারি না।

—তা ত বটেই।

—তা ছাড়া প্রতিটি কেসের বিষয়ে যে কথাবার্তা হবে তার সারাংশ পুলিশ কমিশনারকে জানাতে হবে। তিনি খুব ব্যাকুল হয়ে আছেন এই সব ঘটনার জন্যে।

—বুঝেছি। ঠিক আছে, তাহলে ড্রাগনের কেসটা ক'দিন একটু চাপা দিয়ে আমি নিজে যাব লালবাজারে।

—থ্যাংক ইউ! আর একটা কথা—

—বলুন।

—আপনি যে এসব কেসে হাত দিচ্ছেন তা যেন কেউ ঘুণাক্ষরেও না জানতে পারে।

—না না, তা জানবে না।

—কি করে আপনি তা ম্যানেজ করবেন ?

দীপক হাসল। বললে—ঠিক আছে, যথা সময়ে সব কথা জানতে পারবেন। এখন থাক।

দীপক রিসিভার নামিয়ে রাখল।

---

* [illegible] জানতে হলে এই প্রকাশকের 'ড্রাগন সিরিজ' পড়ুন।

॥ দুই ॥

—আকস্মিক বিপদ

দীপক অল্প পরে তৈরি হয়ে নিল। তারপর সোজা নেমে এলো নিচে।

গাড়িতে উঠে গাড়ি ছেড়ে দিলে। পূর্ণ গতিতে গাড়ি ছুটে চলল, সোজা লালবাজারের দিকে।

দীপক গাড়ির মিছিলের মধ্যে দিয়ে ঠিকমত পথ ধরে চলতে লাগল।

পথে জনপ্রবাহ।

এ যেন বিরাট লোকের মেলা—হাজার হাজার মানুষের সমারোহ।

দীপক কোনও দিকে তাকাল না। তার উদ্দেশ্য হলো কোনও রকমে দ্রুত লালবাজারে পৌছান।

কিন্তু সে খেয়াল করল না যে, একটা গাড়ি তার গাড়ি থেকে কিছুটা দূরে থেকে তাকে অনুসরণ করে আসছিল।

বহুক্ষণ চলার পর দীপকের খেয়াল হলো। সে তার গাড়ির আয়নাতে দেখল একটা গাড়ি ছুটে আসছে তার পেছনে পেছনে।

কালো রঙের গাড়ি। কে তাকে ফলো করছে ঐ গাড়িতে করে?

দীপকের মনে ক্রোধের সঞ্চার হলো।

ঐ গাড়ির আরোহীদের জব্দ করতে হবে যেমন করে হোক না কেন।

দীপক গাড়ির গতি কমাল।

সঙ্গে সঙ্গে পেছনের গাড়িটা তার পাশে এসে পড়ল।

দীপক পিস্তল উদ্যত করল। ঐ গাড়ির টায়ার ফাটিয়ে দিতে হয় তাহলে গাড়িটা থেমে যাবে, ধরা পড়বে ওরা।

কিন্তু—

দীপক গুলি করার আগেই প্রচণ্ড শব্দ হলো—বুম্ বুম্!

একটা হাতবোমা এসে পড়ল দীপকের গাড়ির পাশে।

দীপক ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেল, তবে গাড়ির সামনের অংশ বেশ জখম হলো। গাড়ি গেল বন্ধ হয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে পাশের গাড়িটা ছুটে বেরিয়ে গেল তার গাড়ির পাশ দিয়ে।

দীপক অবাক!

ওরা এত দ্রুত কাজ করল যে, সে তা কল্পনাতেও স্থান দেয়নি।

দীপক গাড়ি থেকে নামল।

গাড়িটা ঠেলে একপাশে রেখে দিল সে। এধারে তাকে যেতেই হবে লালবাজারে। কিন্তু কি করে সে যাবে?

একটা ট্যাক্সি ডাকল দীপক।

ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বললে—জলদি চলো লালবাজারে।

—আচ্ছা সব!

ট্যাক্সি ছুটে চলল লালবাজারের দিকে।

* * *

লালবাজারে মিঃ গুপ্তের সঙ্গে দেখা করল দীপক।

মিঃ গুপ্ত বললেন—আসুন।

—তা ত হলো—কিন্তু কি আশ্চর্য, ওরা কি যাদু জানে?

—তার মানে?

—তা না হলে ইতিমধ্যেই আমাকে কেন ফলো করেছিল ওরা?

—সে কি।

—সত্যি বলছি আমি। ওরা আমাকে সন্দেহ করেছিল। কিন্তু কি কে সন্দেহ করেছিল তা জানি না। আমার গাড়িকে ফলো

করেছিল। আমি যেই পিস্তল তুলেছি, সঙ্গে সঙ্গে বোমা ছুঁড়ল আমার গাড়িতে। তারপর পলাতক।

—ভয়ংকর দল ত ওরা!

—তাই ত দেখছি।

—ওদের পরিচয় জানেন কি, দীপকবাবু?

—না-না—

—ওরা নিজেদের পরিচয় দেয় একটা নম্বর দিয়ে। তা হলো ২৩৫।

—কি বললেন? এই রকম একটা নম্বর লেখা চিঠি যে আমি আজই পেয়েছি।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

দীপক সব বললে মিঃ গুপ্তকে।

মিঃ গুপ্ত সব শুনে বললেন—সেকি! ভয় পেলেন নাকি?

—না—না—আমি অত সহজে যে ভয় পাই না, তা তো জানেন। তাহলে ওদের সঙ্গে এঁটে ওঠা খুবই কঠিন।

—ভাল কথা। ওরা সারা দেশ জুড়ে একের পর এক অন্যায় করে চলেছে। এমন কি, দেশের পর্যন্ত ক্ষতি করছে।

—তার মানে?

—মানে, ওরা এদেশের নানা গোপন খবর ও দলিলপত্র চুরি করে বিদেশী সরকারের কাছে তা বিক্রী করছে।

—সে কি এই দলই?

—নিশ্চয়ই।

—তবে ত ওদের বিষয়ে খুব সাবধানে থাকা উচিত ওদের ধরতে না পারলে ভীষণ ক্ষতি হবে এদেশের।

তা ত হবেই। তাই ত আমরা এত বেশি চিন্তিত হয়ে পড়েছি।

—যা হোক, ভয় পাবেন না। আমার দৃঢ় ধারণা, ওদের আমি ধরতে পারবোই।

এমন সময়—

হঠাৎ ঘন ঘন ফোন বেজে উঠল। মিঃ গুপ্ত রিসিভার তুললেন।

—হ্যালো···কে ?

—আমি দুই-তিন-পাঁচ কথা বলছি।

—কে তুমি ?

—ঐ নম্বরই আমার পরিচয়।

—তুমি কি পুরনো ক্রিমিন্যাল ?

—না। অপরাধ-জগতে আমি নতুন এসেছি, তাই আমাকে আপনারা 'আগন্তুক' নামেই সম্বোধন করবেন।

—আগন্তুক ?

—হ্যাঁ।

—ভাল নাম বলেছো বটে।

—তা ত ঠিকই। তবে আমি যা বলছি তা ভাল করে শুনুন।

—বলো।

—দীপকবাবুকে বলুন, তিনি আজ যদিও ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছেন, তবু আমার পিছনে লাগলে আর বাঁচবেন না।

—আচ্ছা, বলব।

—আর একটা কথা, আমি সম্প্রতি আরও কিছু বড় ক্রাইম্ করব। কারণ আমার টাকা চাই। আমি চ্যালেঞ্জ করছি, অত সহজে আমাকে ধরতে পারবেন না আপনারা।

—তবে এটা তুমি জেনে রেখো আগন্তুক, যে, কারও

গর্বই থাকে না। আর পুলিশ বিভাগ চিরদিন সক্রিয় থাকবে। তাদের কাজ কেউ বন্ধ করতে পারবে না।

—তা জানি। তবে এটাও ঠিক—আমি যতদিন আছি, আমার কাজ ঠিকই চলতে থাকবে। আমাকে কেউ আটকাতে পারবে না।

কথাটা বলে আগন্তুক রিসিভার রেখে দেয়।

মিঃ গুপ্ত খুব উত্তেজিত হয়ে পড়লেন।

তিনি বললেন—শুনলেন কথা ?

—হ্যাঁ, কিছুটা।

—ওরা বলে কি না, ওদের নাকি কেউই ধরতে পারবে না।

দীপক হাসল।

—হাসলেন যে ?

—কারণ এ রকম গর্ব ত অনেকেই করে মিঃ গুপ্ত।

—তা তো দেখেছি।

—তবে আমিও জানি, বেশি গর্ব যারা করে তারাই সহজে ধরা পড়ে। তাই হবে এই ২৩৫ অর্থাৎ আগন্তুকের বেলাতেও।

—কিন্তু গুপ্ত দলিলপত্র চুরির জন্য যে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ছেন কমিশনার সাহেব।

—তা তো জানি।

—তাই সত্বর ওদের ধরতে না পারলে অপমান হতে হবে আমাদের।

দীপক কোনও উত্তর দিলে না।

* * *

বাড়ি ফিরে দীপক সব কথা খুলে বললে রতনকে।

রতন সব শুনে বললে—আমি কিন্তু একটা কথা ভাবছি

—কি ভাবছিস ?

—ওদের দলে পুরোনো লোক তো কিছু নিশ্চয়ই আছে।

—ওদের দলপতি বোধহয় নতুন। তাই তার এত গর্ব। তবে দলে পুরনো লোক থাকা খুব স্বাভাবিক।

—তাহলে খোঁজ নিতে হয়।

—কোথায় খোঁজ নিবি?

দু' একজন পুরানো ক্রিমিন্যালের কাছে খোঁজ নেবার চেষ্টা করবো।

—তা মন্দ নয়। আমিও চেষ্টা করে দেখি কোনও সূত্র পাই কি না।

দীপককে চিন্তিত দেখায়।

॥ তিন ॥

—নতুন বিপর্যয়

অপূর্ব সুন্দর হোটেল হলো 'ডি কাফে'।

আলো ঝলমল সুন্দর হোটেল। তার সঙ্গে আছে বার—অর্থাৎ ওয়াইন ও ফুড্ একত্রে পাওয়া যায় এখানে।

তা ছাড়া হোটেলটার ছিল বিশেষ একটা আড়ম্বর—যার জন্যে অনেক লক্ষপতিও এসে ভিড় করত এই হোটেলে।

যেমন সুন্দর এর রান্না—তেমনি সুন্দর এর বয়-বেয়ারাদের অমায়িক ব্যবহার।

প্রত্যেকেই তুষ্ট। প্রত্যেকেই খুশী।

এই হোটেল দেখলে অনেকটা বিলেতের কোনও হোটেলের কথা মনে হয়।

সাজসজ্জাও চমৎকার। দামী দামী সব আসবাবপত্র—দামী সরঞ্জাম, আমোদ-প্রমোদের জন্য নানান ব্যবস্থাও ছিল।

দোতলা হোটেল।

উপরের তলায় সব যাত্রীদের থাকবার জন্য বিলাস-বহুল ব্যবস্থা। আর নিচের তলায় ছিল বার ও রেষ্টুরেন্ট।

নিচের তলায় একই সঙ্গে নাচ-গানের ব্যবস্থাও ছিল।

কিন্তু তা ছাড়াও ছিল একটা পাতালপুরীর গুপ্ত তলা। এটাকে মাটির নিচের তলা বলা যায়। এখানেও ছিল বিশেষ ব্যবস্থা। তা হলো এখানে নানা ধরনের জুয়া খেলা চলে।

এত সব থাকা সত্ত্বেও হোটেলটার একটা সুনাম ছিল। তার কারণ বাইরে বিশেষ দুর্নাম বের হতো না।

এই হোটেলের মালিক ছিলেন মিঃ জোন্স নামে একজন লোক। লোকটা বাঙালী না বিহারী না অ্যাংলো তা বোঝা যায় না।

যদিও জোন্সের বয়স চল্লিশ পার হয়ে গেছে—তবুও এখনো যেন পুরোপুরি যুবক।

সেদিন হোটেলের সাজসজ্জাটা একটু বেশি মাত্রায় হয়েছিল। অন্য দিনের চেয়ে লোকজনও এসে ছিল অনেক বেশি।

তার কারণ হলো মিস্ লিলি এখানে নৃত্য করবেন। বিশেষ ব্যবস্থা এটা। তা ছাড়া অন্য সব নাচ অর্থাৎ বল্ ড্যান্স ও ডুয়েট ড্যান্স তো আছেই।

মিস্ লিলির প্রোগ্রাম সাতটায় শুরু হবে।

কিন্তু ৬টা বাজতে-না-বাজতেই নানা লোকের ভিড়ে হোটেলটা গম্ গম্ করতে থাকে।

এই হোটেলের একটা কোণের সীটে বসে ছিল দীপক চ্যাটার্জীর সহকারী রতনলাল। তার ঠিক সামনের সীটটা ছিল খালি। রতন অবশ্য দুটি সীটই রিজার্ভ করেছিল। সে বসে বসে ভাবছিল নানা কথা।

—হ্যালো—ডিয়ার! রতন একটি মেয়েকে ডাক দিল।

—ইয়েস্ স্যার!

—এই হোটেলে কি কি পাওয়া যায়?

—সব কিছুই পাওয়া যায় এখানে।

—বেশ। তবে এক প্লেট আলুম দম পাঠিয়ে দাও জল্দি।

—স্যার, আলুর দম তো নেই। মাংসের চপ্ আছে। আর আপনি যদি চান তো ভাল সাথীও মিলে যাবে।

—নন্সেন্স!

মেয়েটা হেসে উঠল। বললে—এটা বাজে হোটেল নয় যে, আলুর [illegible]ানে।

—তবে যাও। পরে অর্ডার দেব।

মেয়েটা চলে গেল।

হঠাৎ দপ্ করে হোটেলের সব আলো নিভে গেল। কেবল স্টেজের উপরে জ্বলতে লাগল একটা হালকা নীল আলো।

বোধহয় শিগ্‌গীর ড্যান্স শুরু হবে।

রতন পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরিয়ে তাতে দুটো টান দিল। তার মন বসছিল না এখানে। কিন্তু দীপকের হুকুম—তাই তাকে বসতেই হলো।

অকস্মাৎ—

রতন পেছনে শুনল একটা নারীকণ্ঠ—হ্যালো—মিস্টার! আপনার সামনের সীটটা কি খালি আছে নাকি?

রতন মুখ ফেরাল। দেখতে পেল একটা যুবতী নারী তার দিকে তাকিয়ে আছে।

—হ্যাঁ, খালি আছে। কিন্তু আপনি—

—আমি বসতে পারি?

—বসুন।

মেয়েটা বয়কে ডেকে দু'প্লেট খাবারের অর্ডার দিল। রতন বাধা দিল না তাকে। দেখা যাক না শেষ পর্যন্ত।

—মিঃ রতনলাল, আপনি কি নাচও ভালবাসেন নাকি? মেয়েটা বললে।

রতন অবাক। বললে—আপনি আমার নাম জানলেন কি করে?

—আপনাকে কে না চেনে।

এমন সময় বাজনা বেজে উঠল। স্টেজে নাচ শুরু হলো।

মেয়েটা নাচ দেখতে লাগল। আর রতন বিস্মিতভাবে অবাক দৃষ্টিতে দেখতে লাগল এই মেয়েটিকে।

হঠাৎ রতন প্রশ্ন করল—আপনার নাম কি মিস্ ?

—জোহরা।

—পরিচয় ?

—এই হোটেলে আসি—এর বেশি পরিচয় দিতে পারব না এখন।

—ঠিক আছে।

নাচ শেষ হলো। এবারে বল ড্যান্স শুরু হবে। মেয়েটা রতনের হাত ধরে বলে উঠল—আসুন, আপনিও নাচবেন।

—আমি !

—হ্যাঁ, ক্ষতি কি ?

—বেশ, চলুন।

রতন মেয়েটার সঙ্গে চলল নিচের আসরের দিকে।

জোহরার সঙ্গে নৃত্য শুরু করল রতন।

এক সময় রতন বললে—জোহরা, ডার্লিং, তুমি কি সুন্দরী !

—তুমিও ত কম সুন্দর নও ডিয়ার !

—আমি ?

—হ্যাঁ, তুমি। তুমিও খুব সুন্দর !

হঠাৎ একটা লোক জোহরার কাছে এসে কানে কানে কি যেন বললে। রতন কথাটা শুনতে পায়নি, তবে অনুমান করতে পেরেছিল।

জোহরা বললে—আচ্ছা ডার্লিং, এবার আমি একটু ওধারে যাব।

—কোথায় ?

—একটু কাজ আছে ওদিকে।

—আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না তুমি ?

—কোথায় যাবে ? জোহরা বললে মুচ্‌কি হেসে।

—পরীদের রাজ্যে—যেখানে তুমি থাকো।

—পথ কিন্তু খুব বিপজ্জনক, মিঃ রতনলাল। তবে তুমি যদি আসতে চাও তো এসো।

—যারা ভালবাসে, তারা বিপদের পথকে ভয় করে না জোহরা।

—সত্যি ?

—নিশ্চয়।

—তাহলে তুমি আমাকে ভালবেসে ফেলেছো নাকি ?

এই কথা বলে মেয়েটা হাত বাড়িয়ে দিল।

রতন জোহরার হাত ধরে বেরিয়ে এলো সেই হোটেল থেকে।

বাইরে রতনের গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। রতন গাড়িতে উঠে জোহরাকে বললে—এসো।

জোহরা তার পাশে বসে পড়ল।

রতন বললে—কোন্ দিকে যেতে হবে তা বলো তো ?

—টালিগঞ্জের দিকে চালাও।

—টালিগঞ্জে কোথায় যাবে তুমি ?

—রিজেণ্ট পার্ক।

—রিজেণ্ট পার্ক যে বেশ মনোরম জায়গা তা রতন জানে। অনেকে এখানে রাতের নিভৃতে আনন্দ উপভোগ করতে যায়।

রতন গাড়ি চালাল।

অন্ধকার রাত। তার উপরে আবার আকাশ খুব মেঘাচ্ছন্ন ছিল।

অন্ধকারের বুক বিদীর্ণ করে এগিয়ে চলল রতনের গাড়ি।

হঠাৎ রতন দেখল, রাস্তার উপরে বিরাট একটা স্টুডিবেকার গাড়ি আড়াআড়িভাবে পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে।

গাড়িতে কেউ নেই।

রতন গাড়ি থেকে নেমে ঐ গাড়ির সামনে গিয়ে জোরে হর্ণ দিতে লাগল, যাতে মালিক এসে গাড়িটা পাশে দাঁড় করায়।

জোহরা পাশে এসে বললে—কেন এত ব্যস্ত হচ্ছো? এ গাড়ি অত তাড়াতাড়ি সরবে না।

—তার মানে?

—এ পথ ভালবাসার পথ নয়, রতনবাবু।

—আমি এ পথেও চলতে জানি। রতনের হাতে পিস্তল দেখা গেল।

সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল অন্য একজন লোক রতনের সামনে এসে হাজির হয়েছে।

—কে তুমি?

—আমি আগন্তুক।

—তুমি।

—হ্যাঁ।

—তোমাকে গুলি করে মারব।

—বৃথা চেষ্টা। ট্রিগার টিপে দেখ, গুলি নেই।

—তার মানে?

—মানে আসল পিস্তলটা আগেই পাল্টে নকলটা তোমার পকেটে-ভরে দেওয়া হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা কি একটা বস্তু রতনের দিকে ছুঁড়ে মারল।

একটা ধোঁয়ায় পথ ভরে গেল। রতন কিছু দেখতে পেল না।

একটু পরে—

ধোঁয়া সরে গেলে রতন দেখল লোকটা ও জোহরা অদৃশ্য হয়েছে।

রতন দেখল পথের উপরে একটা কাগজ পড়ে আছে। তুলে দেখতে পেল সেটা একটা চিঠি। তাতে লেখা:

মিঃ রতনলাল,

আপনি আমাদের চেনেন না, কিন্তু আমরা চিনি আপনাকে।

আমাদের দল অনেক শক্তিশালী, অনেক কৌশলী। তাই আমাদের পেছনে লেগে বৃথা সময় নষ্ট করবেন না।

আজ বেঁচে গেলেন—কিছু বললাম না। তবে ভবিষ্যতে এর বেশি লাগতে গেলে জীবন নিয়েও টান পড়বে।

দয়া করে আপনার মনিব দীপককেও বলে দেবেন, আমাদের ক্ষমতা অনেক—অনেক বেশি। পুলিশ ত অতি তুচ্ছ।

আশা করি আবার দেখা হবে আমার বা আমাদের দলের সঙ্গে।

ইতি—

জোহরা।

রতন চিঠিটা পকেটে নিয়ে ফিরে চলল বাড়ির দিকে।

॥ চার ॥

—সিগ্‌ন্যাল

দীপক চ্যাটার্জী তার ঘরে বসে নানা ফাইলপত্র দেখছিল।

তাকে আজ খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে। এই নতুন ক্রিমিন্যাল দলের কোনও খবরই সে বের করতে পারছে না। অথচ ওদের থেকে মুক্ত হতেও পারছে না সে।

তার সামনের চেয়ারে বসেছিল তার সহকর্মী ও বন্ধু রতনলাল।

রতন তার অভিজ্ঞতা সব বলে যাচ্ছিল। সব কথা শুনছিল দীপক।

এমন সময় সে বলে উঠল—তুই বড় বাজে বকছিস রতন।

—তার মানে?

—মানে তোর কথা বিশ্বাস হচ্ছে না। তোকে আমি এর চেয়েও অনেক ভাল গল্প শোনাতে পারি।

—এটা গল্প?

—তাই মনে হচ্ছে।

—আর এই চিঠিটা?

—দেখি ওটা।

দীপক চিঠিটা ভাল করে দেখল।

তারপর বললে—আচ্ছা, মেয়েটা দেখতে কেমন বল তো?

—খুব সুন্দরী। ফর্সা রঙ, লম্বা টানা-টানা দুটি আয়ত চোখ। পাতলা নাক—লম্বা চেহারা। তা ছাড়া গালে একটা তিলও দেখেছি।

—আর কিছু লক্ষ্য করিসনি?

—হ্যাঁ। মাথায় প্রচুর চুল। বড় খোঁপায় তা বাঁধা ছিল।

—ভেরী গুড্।

এই কথা বলে দীপক টেবিলের ড্রয়ারটা খুলে একটা বড় ছবির অ্যালবাম্ বের করল।

সেই অ্যালবামটা ওল্টাতে ওল্টাতে একটা জায়গায় এসে সে থামল। রতনের সামনে একটা ছবি ধরে বললে—দেখ তো এই ছবিটা কি তুই চিনতে পারিস্?

রতন ভাল করে দেখে বললে—মুখের কাটিং ঠিক জোহরার মতো, তবে তার রঙটা আরও বেশি পরিষ্কার। আর এর সব চুল ত ছোট করে ছাঁটা—তার চুল সব আরও লম্বা—অনেক লম্বা, আর এর মাথাটা ছোট—তার আরও বড়।

দীপক হাসল।

বললে—সব মেক্‌আপের গুণে হয়েছে রে বোকা।

—কিন্তু মেক্‌আপে কি কালো কখনো ফর্সা হয়?

—অবশ্যই হয়। তবে এর নাম জোহরা নয়—এর নাম হলো জলি। তবে আমার মনে হয় এই সেই—যাকে দেখে তুই ভুল করেছিস্।

—এর পরিচয়?

—এ খ্রীস্টান। প্রায় ছ' বছর আগে আফিং গাঁজা স্মাগলিং করার জন্যে এর জেল হয়েছিল। ছ' মাস পরে জেল থেকে বের হয়। তার পরে আর কোনও খবর পাইনি। আমার মনে হয় কাল তোকে যে জোহরা বলে পরিচয় দিয়েছে, সে জলি।

—এই কথা? তাহলে ত কালই ওকে গ্রেপ্তার করতে পারব।

তোর ধারণা ভুল। ওর বিরুদ্ধে তো কোনও প্রমাণ নেই। বিনা চার্জে কাউকে গ্রেপ্তার করা যায় না। তা ছাড়া ও এখন বিরাট এক নামকরা অপরাধীর দলে আছে।

—সেই অপরাধীই তো আগন্তুক?

—হ্যাঁ।

টেবিলের উপরের কলিং বেলে চাপ দিল দীপক। সঙ্গে সঙ্গে একজন বেয়ারা ঢুকল।

দীপক বললে—সার্জেণ্ট রহিম বাইরে আছে, তাকে পাঠিয়ে দাও।

জী সাব্।

দু' মিনিটের মধ্যে সার্জেণ্ট রহিম ঘরে প্রবেশ করল।

—আমায় ডেকেছেন স্যার?

—হ্যাঁ, আজ থেকে তুমি হোটেল ডি কাফের উপরে নজর রাখবে।

—আচ্ছা, স্যার। কিন্তু কি ব্যাপার তা একটু বলুন ত?

—ব্যাপার কিছু নয়—বর্তমানে ঐ হোটেলের উপরে একটু বিশেষ সন্দেহ জেগেছে আমার মনে। আমি চাই তুমি এর ভেতরের সব খবর জেনে আমাকেও তা জানাবে।

—আচ্ছা, স্যার।

সার্জেণ্ট রহিম বেরিয়ে চলে গেল।

রতন বললে—এতে কি কাজ হবে?

—তা জানি না। তবে আশা করছি যে, কিছু কাজ হতে পারে।

রতন কোনও উত্তর দিল না।

* * *

গভীর রাত্রি।

সারাটা পৃথিবী যেন ঘুমিয়ে পড়েছে একটা নিথর নিদ্রার কোলে।

এমন সময়—

একটা বড় গ্যারেজের মতো ঘর উল্টোডাঙ্গার খালের ধারে।

এই ঘরে ঘন ঘন শব্দ শোনা গেল। ফোন বেজে উঠল।

একজন লোক দৌড়ে গিয়ে রিসিভার তুলে নিয়ে বললে—হ্যালো, ক?

—আমি জিরো ওয়ান ওয়ান।

—ঠিক আছে স্যার।

—তুমি কে ?

—উল্টোডিঙ্গির লোক।

—সিগন্যাল ?

—টু থ্রি ফোর।

—ও. কে.। বল ওদিকের সব খবর কি ?

—খবর ঠিক আছে।

—তিন নম্বর আড্ডায় মাল সব পৌঁছে গেছে তো ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—সব পৌঁছে গেছে।

—কেউ পিছু নিয়েছিল ?

—না। মনে হয় কেউ সন্দেহ করতে পারেনি আমাদের।

—ঠিক আছে। সব সময় খুব এলার্ট থাকবে। আর কাল তোমার কি ডিউটি তা মনে আছে ত ?

—হ্যাঁ স্যার।

---ঠিক সময়মত হাজির হবে তুমি ডিউটিতে।

—আচ্ছা।

লোকটা রিসিভার নামিয়ে রেখে দিল।

পাঁচ

—নারী হরণ

কোলকাতা শহরের একজন নামকরা ধনী ও সারা ভারতের বুকে বিখ্যাত লোক হলেন রামরূপ সিং। সকলে তাঁকে সংক্ষেপে ডাকে রামসিং বলে।

তিন পুরুষ কোলকাতা শহরে তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য করে চলেছেন।

এইভাবে আজ রামসিং শহরের একজন শ্রেষ্ঠ ধনী। তবে লোকে তাঁর নামে অনেক বদনামও করে। লোকে বলে রামসিং হলেন আসলে একজন জালিয়াৎ লোক।

তা যাই হোক, আজ রামসিং লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক। তিনি নিজে ম্যাট্রিক ফেল—কিন্তু তাঁর অফিসে বহু বি-এ., এম.-এ. পাস লোক চাকরি করে।

আর অফিসের লোকেরা রামসিংকে খুবই ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে থাকে।

তার কারণও অবশ্য আছে। লোকের বিপদে-আপদে রামসিং সাহায্য করেন। কোনও কর্মচারী অসুস্থ হলে বা তার বিপদ ঘটলে রামসিং পাশে এসে দাঁড়ান।

সেদিন সকাল।

রামসিং অন্য দিনের মতো সকালে ঘুম থেকে উঠে চা খাচ্ছিলেন। সামনে ছিল খবরের কাগজ।

রোজ খবরের কাগজ পড়েন রামসিং। বিশেষ করে ফাট্‌কার বাজার তে তিনি অভ্যস্ত। তাছাড়া শেয়ার মার্কেটের অন্য খবরও দেখেন।

সেদিন তিনি কাগজ দেখছেন—এমন সময় এলো একটা চিঠি। ত আগত পত্র।

চিঠিটা নিয়ে খামের মুখটা খুলে পড়তে লাগলেন রামসিং।

পড়তে পড়তে মুখখানা হঠাৎ যেন গনগনে হয়ে উঠল তাঁর।

একি দেখছেন তিনি? একি সত্যি?

চিঠিতে লেখা ছিল:

মাননীয় রামসিং,

আপনি দীর্ঘদিন ধরে চোরাকারবার করে, সরকারকে ফাঁকি দিয়ে ও দেশের লোকের বুকের রক্ত নিংড়ে লক্ষ লক্ষ টাকা উপায় করেছেন। আর কেউ তা না জানলেও আমি জানি।

আমি চাই তার একটি অংশ অর্থাৎ মাত্র এক লক্ষ টাকা আপনি আমাদের দেবেন। যদি দিতে চান তাহলে আপনি আপনার বাড়ির সামনে একটা লাল পতাকা তুলে রাখবেন। তাহলেই বুঝতে পারব।

আর যদি তা না দিতে চান, তা হলে ভয়ংকর বিপদে পড়বেন। এই বিশ্বে কেউ রক্ষা করতে পারবে না আপনাকে।

আশা করি আপনি আমাদের মতের বিরুদ্ধে যাবেন না। গেলে আপনার মৃত্যু হতে পারে—অথবা অন্য কোনও বিপদও হতে পারে।

আমার কথাকে অবহেলা করে নিজের বিপদ ডেকে আনবেন না আশা করি।

এখানেই শেষ করলাম। এখন ভবিষ্যৎ আপনার হাতে। ইতি—

আগন্তুক।

চিঠিটা পড়ে রামসিং রেগে উঠলেন।

কোথাকার কে ডাকু—তার কি-না এত সাহস যে তাঁকে ভয় দেখায়!

তিনি ফোন তুললেন।

—হ্যালো, কে?

—আপনি কি দীপকবাবু?

—হ্যাঁ।

—আমি রামসিং বলছি। একবার ক্লাবে আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।

—বলুন কি বলতে চান।

—এক ডাকু ব্যাটা আমাকে ভয় দেখিয়ে চিঠি লিখেছে।

—কে সে?

—তা জানি না।

—তবে পুলিশে জানান। আমার এখন অনেক কাজ।

—বহুৎ ইনাম দেব।

—বললাম না ব্যস্ত আছি এক দুর্ধর্ষ দস্যুর পেছনে। তাদের দলের নাম আগন্তুক।

—আগন্তুক?

—হ্যাঁ।

—আমাকেও তো ওরাই চিঠি দিয়েছে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

—তবে আমি আসছি। আপনি লালবাজারের মিঃ গুপ্তকেও কথাটা জানান।

—আচ্ছা স্যার।

দীপক রিসিভার নামিয়ে রাখল।

রামসিং ফোন তুললেন লালবাজারে কথাটা জানাতে।

* * *

একটু পরে—

দীপক আর মিঃ গুপ্ত এলো রামসিংয়ের বাড়িতে।

সব শুনে দীপক বললে—ভাল করে পাহারার ব্যবস্থা করুন মিঃ গুপ্ত।

—আচ্ছা।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশবাহিনী সারাটা বাড়ি ঘিরে ফেলল।

যেন একটা কাকপক্ষী পর্যন্ত বাড়িতে ঢুকতে বা বের হতে না পারে এমনি ব্যবস্থা হলো।

বেলা দশটা বেজে গেল।

তারপর এগারোটা।

এমন সময় একজন লোক ছুটতে ছুটতে এলো রামসিং-এর বাড়িতে। পুলিশ পথরোধ করল।

লোকটি বললে—এটি কি শেঠ রামসিংএর বাড়ি নাকি?

—হ্যাঁ।

—তিনি আছেন?

—আছেন।

—একবার দেখা করতে চাই।

—দেখা ত হবে না এখন।

—কেন?

—তিনি ব্যস্ত আছেন।

—তাঁকে বলুন, আমি রমলার স্কুল থেকে আসছি।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

সঙ্গে সঙ্গে দীপক নেমে এলো দোতলা থেকে একতলায়।

দীপক প্রশ্ন করলে—আপনি কে?

—আমি রামসিং-এর একমাত্র মেয়ে মিস্ রমলার স্কুল থেকে আসছি।

—কি ব্যাপার?

—আজ ভয়ংকর কাণ্ড ঘটে গেছে।

—তার মানে?

—মানে মিস্ রমলা যখন আসছিলেন স্কুল থেকে, তখন একটা গাড়ি

হঠাৎ কোত্থেকে এসে তাকে তুলে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়। আমরা অবশ্য পুলিশেও ফোন করেছি।

—কোন্ স্কুল?

—কন্যা বিদ্যালয়।

—মেয়েটির বয়স কত?

—উনিশ হবে। সে ক্লাস টেন-এ পড়ত।

—আচ্ছা, দেখছি।

দীপক দোতলায় উঠে গেল।

রামসিংকে বললে—আপনার মেয়ের নাম কি রমলা দেবী?

—হ্যাঁ। তার কি হয়েছে?

—তাকে কে বা কারা গাড়িতে করে তুলে নিয়ে গেছে।

—বলেন কি?

—হ্যাঁ।

—সে-ই যে আমার একমাত্র মা-হারা মেয়ে। হায় ভগবান!

রামসিং কেঁদে ফেললেন।

দীপক বললে—রমলা কখন স্কুলে যায়?

—সকাল ছটায়।

—তার মর্ণিং ক্লাস?

—হ্যাঁ।

—তাহলে দস্যুরা এটা জানত। তাই তারা আশেপাশে ছিল।

—তা হতে পারে।

—কিন্তু আমি আশা করিনি তারা এই পথে যাবে। তাদের বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়।

এমন সময়—

ঘন ঘন ফোন বেজে উঠল।

রামসিং ফোন তুললেন—হ্যালো, কে আপনি বলুন ?

—আমি আগন্তুক।

—তুমি আগন্তুক ?

—হ্যাঁ।

—শয়তান !

—মিথ্যা গালাগালি দেবেন না রামজী। এটা আমার কর্তব্য।

—কর্তব্য ? তার মানে ?

—মানে আপনার মেয়ের কোনও ক্ষতি হবে না। এক লক্ষ টাকা দিলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে ছেড়ে দেবো আমরা। আর তা না হলে সে মারা যাবে বা তাকে বিদেশে বিক্রি করব।

—তোমাকে কুত্তা দিয়ে খাওয়ানো উচিত।

—তা যা খুশী বলতে পারেন। আমি যা চাই তা বললাম।

—আমি এক্ষুণি বলতে পারব না। একটু চিন্তা করে বলব।

—ঠিক আছে।

—রিসিভার রাখলেন রামসিং। দীপকদের সব কথা বললেন।

দীপক বললে—ওরা চালাক।

—তার মানে ?

—মানে মানুষের দুর্বল জায়গায় ঠিকমত আঘাত দেয়।

—তা দেখতেই পাচ্ছি।

—তবে একটা কথা। আমি জানি ওরা ধরা পড়বেই।

—তা পড়বে। কিন্তু এখন আমি কি করি বলুন তো স্যার ?

দীপক চিন্তা করছিল।

মিঃ গুপ্ত বললেন—এখন টাকা দিলে ওরা খুব শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

—তা বটে।

—তার চেয়ে তিনদিন সময় নিন। আমরা চেষ্টা করব এর মধ্যেই ওদের ধরতে।

—পারবেন ?

—চেষ্টা করতে দোষ কি ?

—ঠিক আছে।

দীপক সেই মত পরামর্শ দিয়ে বেরিয়ে এলো রামসিং-এর বাড়ি থেকে।

॥ ছয় ॥

—রহস্যময়ী

দীপক যদিও চুপচাপ বেরিয়ে এলো কিন্তু সে জানত, তার অভিযান ব্যর্থ হয়নি।

তার কারণ ফোনে রামসিংএর কাছ থেকে খবর পেয়েই সে রতনকে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিল রমলাদের স্কুলে—সে জানত এই ধরনের একটা আঘাত আসতে পারে অন্য দিক থেকে।

অবশ্য রমলাকে সে আগেই চিনত—কারণ রামসিং-এর মেয়ের এক বান্ধবী ছিল দীপকের বন্ধুর বোন।

রতন স্কুলের সামনে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সে চিনত না রমলাকে।

রতন গাড়িতে বসে বসে শুধু পাহারা দিয়েই চলেছিল।

এমন সময় সে দেখতে পেল যে, একটা গাড়িতে জোর করে একটা মেয়েকে তোলা হলো। আর সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোকজন হৈ-হৈ করে উঠল।

রতন গাড়িতে বসে বসেই অপেক্ষা করছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা ছুটিয়ে দিল।

দুটি গাড়ি দ্রুত ছুটে চলল—অবশ্য বেশ কিছুটা ব্যবধান রেখে।

আগের গাড়িটা মাঝে মাঝে পথের বাঁকে মিলিয়ে যায়—আবার মাঝে মাঝে দেখা যায় সেটা।

কোলকাতা থেকে হাওড়া—

তারপর গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। গাড়ি দুটি ছুটে চলল।

অবশেষে উত্তরপাড়া, কোন্নগর, শ্রীরামপুর, সেওড়াফুলি প্রভৃতি পেরিয়ে গাড়িটা এসে গেল চন্দননগরে।

একটা হোটেলের সামনে গাড়িটা থামল।

রতন দেখল সেটা একটা বড় হোটেল। তার মধ্যে গাড়িটা ঢুকে পার্ক করল।

রতন দূরে তার গাড়িটা দাঁড় করালো।

সে গাড়ি থেকে নামল।

তার পরে রতন ঢুকে গেল হোটেলের মধ্যে।

বিরাট হলঘর।

রতন দেখল সার সার সব লোক বসে বসে খাচ্ছে।

রতন একটা টেবিলের সামনে এগিয়ে গেল।

একি! এ ত সেই জোহরা! তার সঙ্গে একজন লোক।

তাহলে চুরি-করা মেয়েটা গেল কোথায়?

রতন বললে—জোহরা, তুমি এবারে ধরা পড়বে।

—কে জোহরা?

—তুমি।

—কি যা তা বলছেন? আমার নাম তো উর্মিলা।

—রতন লোকটার দিকে তাকাল। বলল—আপনি সুনীল সরকার না? বিখ্যাত সাতারু?

—হ্যাঁ।

—একে চেনেন?

—হ্যাঁ, এর নাম তো উর্মিলা।

—কোথায় এর সঙ্গে আলাপ আপনার?

—এই হোটেলেই।

—এখানে রোজ আসে?

—মাঝে মাঝে। আজ ফোনে বলেছিল যে ও আসবে। তাই আমি এসেছি।

—গাড়িটা কি আপনার ?

—না, গাড়ি ত উর্মিলা দেবীর। আমি ত অনেক আগে ট্রেনে এসেছি। এখানে বসে আছি ওঁর প্রতীক্ষায়।

রতন বললে—উর্মিলা দেবী, গাড়ির কি কোনও লাইসেন্স আছে ?

—আছে।

—দেখি।

—এই দেখুন।

উর্মিলা একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স আর গাড়ির লাইসেন্স বের করে দেখায়।

রতন দেখল।

সত্যি, তাতে ঠিকানা লেখা : উর্মিলা দেবী, ৮নং সাদার্ণ পার্ক।

রতন ঘাবড়ে গেল।

তাহলে সে কি ভুল গাড়িকে ফলো করে চলল নাকি ?

তা হতে পারে বটে।

কিন্তু জোহরার চেহারা ? তা ত আর ভুল হতে পারে না। তাহলে ?

রতন বললে—আচ্ছা, আজ আমি ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু বেশিদিন এভাবে চলবে না, তা জেনে রাখ জোহরা।

—কি যা তা বলছেন ?

—তার মানে ?

—গেট্ আউট !

রতন ভয়ে ভয়ে বেরিয়ে চলে এলো।

তারপর সোজা সে এলো কোলকাতার সেই সাদার্ণ পার্কে।

ওখানে আট নম্বর খুঁজে পেতে তাকে বেগ পেতে হলো না।

কিন্তু নির্দিষ্ট নম্বরে এসে সে হতাশ হয়ে গেল। দেখতে পেল বাড়ির নেম্ প্লেটে লেখা আছে :

মিঃ শর্মা
অ্যাড্‌ভোকেট, ক্যালকাটা হাইকোর্ট
৮নং সাদার্ণ পার্ক, বালিগঞ্জ।

রতন চুপচাপ গাড়িতে উঠল।

ফিরে চলল বাড়ির দিকে।

তাঁর মনে নানা চিন্তা।

তাহলে কি মিস্ জোহরাই তাকে শেষ পর্যন্ত প্রতারণা করল?

তাহলে বিখ্যাত সাঁতারু সুনীল সরকার এলো কি করে এখানে?

রতন কোনও প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেলো না মনে মনে।

তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। কি কৈফিয়ৎ সে দেবে দীপককে?

* * *

বাড়ি ফিরে রতন দেখতে পেল যে, দীপক ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে কতকগুলো চিঠির হাতের লেখা পরীক্ষা করছে।

রতন ডাক দিল—দীপক!

—কি রে? কি বলছিস?

—এদিকে অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে।

—জানি। রমলা চুরি গেছে। তারপর কি হলো তা বল ত?

রতন সব বললে।

দীপক বললে—তুই জোর বেঁচে গেছিস রতন আজ।

—তার মানে? তাহলে কি অন্য কোনও গাড়িকে ভুল করে ফলো করেছিলাম?

—না।

—তবে?

—ঐটাই ঠিক গাড়ি ছিল।

—তা হলে উর্মিলা দেবী—

—ঐ ত জোহরা ওরফে জলি।

—সে কি!

—ঠিকই বলছি।

—তাহলে লাইসেন্সটা?

—সেটা ত জাল।

—আর সুনীল সরকারের রহস্যটা তাহলে কি বল ত?

—সে ওকে উর্মিলা বলেই জানে। আজ তাকে ওখানে আগে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করে রেখেছিল নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে।

—সে কি!

—ঠিকই বলছি।

—আর সাদার্ণ পার্কের মিঃ শর্মা?

—তিনি জানেনই না যে, জোহরা তার নামেই লাইসেন্স—মানে ফলস্ লাইসেন্স তৈরি করেছে।

—আর গাড়িটা?

—ওটাও দেড়শো টাকা দিয়ে দুদিনের জন্যে ভাড়া করা গাড়ি। নম্বর প্লেটটাও নিশ্চয় পাল্টানো হয়েছিল।

রতন কি ভাবল। তারপর বললে—তাহলে মেয়েটা মানে রমলা গেল কোথায়?

—তাকে জোহরার সঙ্গী লোকটা নিয়ে আগেই সরিয়ে ফেলেছে।

—তাহলে চন্দননগরের ঐ হোটেল ত খুব খারাপ দেখছি।

—হতে পারে।

—তাহলে ওদের মালিককে অবশ্যই ধরা উচিত।

—বৃথা চেষ্টা। কোনও প্রমাণ নেই।

—রমলা সেখানে নেই?

—মাথা খারাপ ! এতক্ষণ সে কোথায় পাচার হয়ে গেছে।

রতন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—সর্বনাশ !

—তার মানে ?

—মানে ওরা ভয়ংকর একটা দল।

—তা ত বটেই।

—তাহলে এখন উপায় ?

—তা পরে ভাবা যাবে। তুই এখন একটু বিশ্রাম করগে যা।

দীপক চুপচাপ চিন্তা করতে লাগল।

॥ সাত ॥

—পুনরাক্রমণ

একটা সুসজ্জিত ঘরের মধ্যে বসেছিল এক সুন্দরী তরুণী।

এমন সময় একজন মুখোসধারী লোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

তরুণী উঠে দাঁড়াল।

—লোকটি বললে—কি খবর বল ?

—খবর ভাল। আমি লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছে দিয়ে এসেছি ঠিক ঐ হোটেল পর্যন্ত।

—ঠিক আছে।

—কেউ কি তোমাকে ফলো করেছিল ?

—তা করেছিল।

—কে ?

—রতনলাল।

—তাহলে দীপকও বোধহয় পিছনে ছিল।

—তা হতে পারে।

—তারপর কি হলো ?

—রতনকে একেবারে দুনিয়ার বোকা বানিয়ে ছেড়ে দিলাম।

—সত্যি ?

—সত্যি না হলে আর আমি এলাম কি করে ?

—মেয়েটা কোথায়—মানে রমলা ?

—সে ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেছে। ঐ হোটেলের পেছনের দরজা দিয়ে তাকে পাচার করে দিয়েছি ততক্ষণে। এখন সে বোধ হয় আমাদের ঘরেই বন্দী আছে।

—কিন্তু শেঠ রামসিং বড় শয়তান।

—কেন ?

—সে এখনো টাকা দিতে স্বীকার করেনি

—যাবে কোথায় ? টাকা দিতেই হবে।

—তা ত বটেই।

—তবে একটা কথা।

—কি ?

—ঐ সন্তরণবীরকে ঠকিয়ে পাঁচশো টাকা নিয়ে এসেছি।

—খুব ভাল।

—আর গাড়িটাও সে ভেবেছে আমার গাড়ি—ঐ মিথ্যা লাইসেন্স দেখে।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ, তাকে গাড়িটা পাঁচ হাজার টাকায় বিক্রি করে দিয়েছি।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ। এখন গাড়িওলা ব্যাটা মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকুক।

—তা ত বটেই। আর গাড়ির নম্বর, রং, সব ত পাল্টে গেছে। কেউ ধরতেও পারবে না।

—তা ত নিশ্চয়ই।

একটু থেমে জোহরা বললে—যাক, অনেক পরিশ্রম হয়ে গেছে। এবার একটু খানাপিনা ত চাই।

—তা ত বটেই।

—বেশ, তার ব্যবস্থা করো এবার।

মুখোসধারী দুটো গ্লাস টেনে নিয়ে তাতে বিলিতি পানীয় ঢালল।

দুজনে কিছুটা পান করে ফেলল। তারপর মুখোসধারী বললে—জোহরা !

—কি ?

—তুমি খুব কাজের মেয়ে।

মুখোসধারী তাকে খুব উৎসাহিত করল।

তারপর বললে—এবারে দেখ জোহরা, আমার নতুন খেলা।

—নতুন খেলা ?

—হ্যাঁ।

—সে কি রকম ?

—এক্ষুণি দেখতে পাবে।

মুখোসধারী ফোনের রিসিভার তুলে নিল।

* * *

—হ্যালো, কে ?

—আমি দীপক চ্যাটার্জী বলছি।

—খুব ভাল। আমি আগন্তুক কথা বলছি মিঃ চ্যাটার্জী।

—তুমিই আগন্তুক ?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

—তা হঠাৎ কি ব্যাপার ?

—আজ আমার একটা নূতন খেলা দেখতে পাবে তুমি ?

—নতুন খেলা ?

—হ্যাঁ।

—সে কি রকম ?

—কাল বেলা ঠিক এগারোটায় কোলকাতা শহরের কোনও ব্যাঙ্ক লুঠ হবে। তোমার বা পুলিশের ক্ষমতা থাকে ত আমাকে বাধা দিও।

—কি যা তা বকছ।

—ঠিকই বলছি।

—আচ্ছা, দেখা যাবে কতদূর কি করতে পার তুমি।

—ঠিক আছে—আমার ক্ষমতা তোমাকে দেখিয়ে দেব।

—অল্ রাইট।

দীপক রিসিভার নামিয়ে রাখল।

* * *

সময় কেটে চলে।

দীপকের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। কোলকাতা শহরের সব ক'টি ব্যাঙ্কে পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা সে করেছে মিঃ গুপ্তকে বলে।

পরদিন বেলা এগারোটা।

পার্ক ষ্ট্রীটের উপরে একটি হলো ব্যাঙ্ক অব লণ্ডন।

এটি একটি বিলিতি ব্যাঙ্কের শাখা। এদের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার চলে দেশে আর বিদেশে সর্বত্র।

বেলা ঠিক এগারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কের সামনে দুটো গাড়ি এসে দাঁড়াল।

ব্যাঙ্কের ঠিক কাউণ্টারে ছিল চারজন লোক। তারা হঠাৎ পিস্তল বের করে ক্যাশিয়ার ও অন্য সব লোককে উদ্দেশ্য করে বললে—সাবধান! বেশি নড়াচড়া করবেন না, তাহলে মৃত্যু অনিবার্য।

সকলে চুপ করে দাঁড়াল।

পথে লোকজন ছিল।

গাড়ি থেকে নামল চারজন। তারা কয়েক রাউণ্ড ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করতেই ব্যাঙ্ক ফাঁকা হয়ে গেল।

যারা ভেতরে ছিল তারা ক্যাশিয়ারের সামনে যা পেল তা তুলে ব্যাগে ভরে ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করতে করতে বেরিয়ে এলো।

তারা পথে নেমে ভাগাভাগি করে দুটি গাড়িতে চাপল।

সঙ্গে সঙ্গে দুটি গাড়িই পূর্ণ উদ্যমে ছুটে চলল প্রকাশ্য রাজপথ ধরে।

পুলিশ যে দু' চারজন ছিল তারা দস্যুদের এই কাণ্ডকারখানায় চুপ করে ছিল।

এবার তাদের একজন এগিয়ে গেল। সে ফোনের রিসিভার তুলল। তারপর যোগাযোগ স্থাপন করল লালবাজারের সঙ্গে।

—হ্যালো লালবাজার?

—হ্যাঁ।

—আমি ব্যাঙ্ক অব লণ্ডন থেকে বলছি।

—কি ব্যাপার বলুন ত?

—এই মাত্র ব্যাঙ্ক অব লণ্ডনে একটা বিরাট ডাকাতি হয়ে গেল।

—এক্ষুণি?

—হ্যাঁ। দস্যুরা ছিল আটজন। চারজন আগেই ভেতরে ছিল—অন্য চারজন এসেছিল গাড়ি করে।

—তারা ভেগেছে?

—হ্যাঁ।

—পুলিশ ভ্যান তাদের ফলো করেনি?

—না। তখন এখানে পুলিশ ভ্যান ছিল না।

—বুঝেছি।

মিঃ গুপ্ত ফোনটা নামিয়ে রাখেন। তাঁর মুখে নেমে আসে হতাশা

।। আট ।

—প্রফেসার হেসিং

হোটেল ডি কাফে।

রতন দীপকের নির্দেশে এই হোটেলের উপরে নজর রেখেছিল। রতন একটা খালি চেয়ারে বসে সিগারেট টানছিল।

একটি সুন্দরী যুবতী আর একটি যুবককে দেখা গেল হোটেলে ঢুকতে। রতন সেদিকে চেয়ে দেখছিল সে কি তাদের চেনে? না—চেনে না সে।

এমন সময় পাশ থেকে কে যেন বলে উঠল—স্যার, আপনার ফোন।

—ফোন!

—হ্যাঁ।

—আমাকে কে ফোন করবে এখানে?

—আপনি ত রতনবাবু?

—হ্যাঁ।

—তাহলে শুনুন—ফোনে কে যেন একজন ডাকছেন আপনাকে।

—চল দেখি।

রতন ফোন ধরল।

—হ্যালো, কে?

—আমি দীপক বলছি।

—বল্।

—শোন, বারো নম্বর সীটে যে লোকটা বসে আছে—তাকে দেখ। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি—চোখে রোল্ডগোল্ডের চশমা।

—দেখেছি।

—সে হলো ডক্টর হেসিং! একজন বড় ডক্টর অব সায়েন্স।

—সে কি!

—হ্যাঁ। লোকটির উপরে নজর রাখ তুই। লোকটা বের হলে তুই ফলো করবি। আমি এলগিন রোডের মোড়ে আছি।

—আচ্ছা।

—তার সঙ্গে একটি মেয়ে আছে ত?

—তা আছে।

—বেশ, ভাল করে নজর রাখবি। সব কথা মনে থাকে যেন!

—তা থাকবে।

—বেশ, ফোন ছেড়ে দিলাম।

—আচ্ছা।

রতন তাকাল।

দেখল দু'জনে সামান্য কিছু খেয়ে বিলটা মিটিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

রতন তৈরি হলো।

এদের ফলো করতে হবে তাকে।

সে লোকটা ঐ মেয়েটার পেছনে পেছনে বাইরে বের হলো।

দেখল দুজনে একটা চকোলেট রঙের গাড়িতে চেপে বসল।

রতন নিজের গাড়িতে চেপে ওদের ঠিক পেছনে অনুসরণ করল।

অবশেষে চকোলেট গাড়িটা এলগিন রোডের মাথায় আসতেই রতন গাড়ি থামাল।

সঙ্গে সঙ্গে দেখল ছদ্মবেশী দীপক গাড়িতে উঠে বসল!

রতন আবার স্পীডে গাড়িটা চালিয়ে দিল।

দুটি গাড়ি ছুটে চলল কোলকাতা নগরীর বুকের উপর দিয়ে।

আগের গাড়িটা বোধহয় বুঝতে পেরেছিল যে, ওদের ফলো করা হচ্ছে।

মেয়েটি বললে—মনে হচ্ছে ওরা আমাদের অনুসরণ করছে।

—তা হতে পারে।

—সাবধানে থাক।

—আচ্ছা। কিন্তু ওরা আমাদের কিছুই করতে পারবে না।

গাড়ি দুটো দ্রুত চলল। অবশেষে দুটি গাড়ি শ্যামবাজার পেরিয়ে বি-টি রোড ধরে চলল এগিয়ে।

হঠাৎ ঘটল একটা ঘটনা।

সামনের গাড়ি থেকে কি একটা জিনিস যেন ছুটে এলো পেছনের গাড়ির দিকে।

দেখা গেল ধোঁয়া।

দীপক ও রতনের মনে হলো তাদের মাথা ঘুরছে। তারা বোধহয় অজ্ঞান হয়ে যাবে।

সত্যি তারা গাড়ি একপাশে দাঁড় করাবার সঙ্গে সঙ্গে সেই ধোঁয়ার গন্ধে অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

অনেকক্ষণ তারা অজ্ঞান ছিল।

রতনের মাথা স্টিয়ারিং-এর সঙ্গে ঠুকে গেছিল। সে জ্ঞান হারাবার আগে মাথাটা সামান্য আহত হলো।

অবশেষে প্রায় একঘণ্টা পরে তাদের জ্ঞান ফিরল।

আগে দীপকের জ্ঞান ফিরল। তারপর সে রতনের মাথায় জল ঢেলে তারও জ্ঞান ফেরালো।

দুজনেই খুব দুর্বলতা অনুভব করতে লাগল।

রতন বললে—কোন্‌দিকে যাবি এখন?

—কোথাও নয়।

—তার মানে ?

—মানে বাড়ি ফিরে চল।

অগত্যা রতন গাড়ির মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে চলল বাড়ির দিকে।

* * *

নিজের পাতালপুরীর ল্যাবরেটারীতে বসে সেই মুখোসধারী কি যেন করছিল।

তার সামনের টেবিলে কি যেন একটা যন্ত্র ছিল।

সে এবারে গিয়ে সেই যন্ত্রের একটা সুইচ টিপে দিল।

একটা ঘড় ঘড় শব্দ শোনা গেল।

লোকটা তারপর মেসিনে মুখ লাগিয়ে বলে উঠল—হ্যালো, আগন্তুক স্পিকিং—

—ইয়েস স্যার। জিরো ডবল বি স্পিকিং।

—তোমার কাজ ঠিকমত হয়েছে ?

—হ্যাঁ, স্যার। মাল পৌঁছে দিয়ে এসেছি।

—ঠিক আছে। এবারে তোমাকে অন্য একটা কাজের ভার দেব। এটা খুব কঠিন কাজ।

—আমি কি সে কাজ করতে পারব ?

—নিশ্চয় পারবে।

—আচ্ছা বলুন—আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব।

—বহুৎ আচ্ছা। শোন, দীপক চ্যাটার্জী আর তার সহকারী রতন-লালকে গ্রেপ্তার করতে হবে। যেমন করে হোক, আজই একাজ করতে হবে।

—জীবিত না মৃত ?

—জীবিত চেষ্টা করবে—তা না হলে মৃত হলেও আপত্তি নেই।

—আচ্ছা, স্যার।

—তোমাকে সাহায্য করার জন্য আমি পাঠাচ্ছি জিরো ডবল ফাইভকে।

—ও, কে, স্যার। আমরা দুজনেই যথেষ্ট। আর লোক চাই না।

—ঠিক আছে।

কানেকশন কেটে গেল।

* * *

হোটেল ডি স্পেন।

সন্ধ্যা ঠিক ছটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে এখানে প্রচুর লোকের ভিড় হতে থাকে।

সেদিন দেখা গেল আলোকমালা সজ্জিত এই হোটেলে রতনও উপস্থিত।

সে এসেই একটা চেয়ার দখল করে বসে পড়ল।

রতনের ঠিক সামনে একটি সুন্দরী যুবতী বসেছিল। সে বার-বার তাকিয়ে দেখছিল রতনকে।

রতন তাকে দেখে আনন্দের সঙ্গে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিল।

হঠাৎ সেই মেয়েটি রতনের টেবিলে এসে বসল। বললে—মনে হচ্ছে যে আপনি আজ একা—তাই না?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, আপনিই রতনলাল না?

—ঠিক কথা। কিন্তু—

—ভাবছেন আমি আপনাকে ঠিকমত চিনলাম কি করে—তাই না?

—তা ঠিক।

—যদিও আমি সামনাসামনি কখনো আপনাকে দেখিনি, তবু আপনার ছবি অনেক দেখেছি কাগজে।

—তা হবে। আপনার নাম?

—মিস্ লয়লা।

—লয়লা ?

—হ্যাঁ।

—সুন্দর নাম। যেমন মিষ্টি চেহারা, তেমনি সুন্দর নাম। আপনি থাকেন কোথায় ?

—পার্ক ষ্ট্রীটে আমার ফ্ল্যাট আছে।

—খুব ভাল।

রতন ভালভাবে মেয়েটিকে দেখতে শুরু করল।

মেয়েটি বলল—আপনি এত মনোযোগ দিয়ে কি দেখছেন ?

—দেখছি আপনাকে।

—আমি কি এমন মেয়ে যে—

—বললাম ত আপনি অপরূপ সুন্দরী মেয়ে।

—তা হতে পারে। যাক্, আপনি কি পান করবেন ?

—আপাততঃ পেট ভরে আছে।

—তাই নাকি ? তবে ত খুব ভাল। কিন্তু আপনি এভাবে ঠাট্টা করছেন কেন ?

—ঠাট্টা নয় মিস লয়লা। আপনাকে খুব ভাল লেগেছে। যাক্, পান এখন থাক—কিছু খাওয়া যাক।

—বেশ ত অর্ডার দিন।

রতন অর্ডার দিল।

দুজনে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বেরিয়ে পড়ল পথে।

রতন বললে—চলুন একটু বেড়ান যাক।

—চলুন। কিন্তু আজ ত আপনি গাড়ি নিয়ে বের হননি ?

—না।

—তবে চলুন আমার গাড়িতে করেই বেরুবেন একটু।

—বেশ ত, চলুন।

দুজনে বেরিয়ে পড়ল। লয়লাই গাড়ি ড্রাইভ করতে লাগল।

অনেকটা গেছে তারা, এমন সময় রতন বললে—এ কোন্ দিকে চলেছেন আপনি!

—কেন—ইডেনের দিকে?

—না।

—তবে কোথায় যাব?

—লেকে চলুন।

গাড়ি ছুটল লেকের দিকে।

লেকের ধারে এসে দুজনে বসল ঠিক মুখোমুখি।

রাত তখন প্রায় নটা বাজে। চারদিকে নির্জন—আলো-আঁধারির খেলা।

রতন বললে—বেশ জায়গাটা, তাই না?

—তা বটে।

লয়লা বসল রতনের গা ঘেঁষে।

রতনের খুব ভাল লাগল।

সে ডাক দিল—লয়লা ডার্লিং—

—কি বলছো।

—কিছু না, দেখছি তোমাকে।

এই সুযোগ লয়লা রতনের পকেট থেকে পিস্তলটা টেনে নিল। তারপর হঠাৎ তা রতনের দিকে উদ্যত করে বললে—চুপ করে বসে থাক।

—তার মানে।

—মানে কথাটি ব'লো না---বিপদে পড়ে যাবে।

—তুমি কি আগন্তুকের দলের লোক?

—হ্যাঁ, তাই।

রতন কথা বললে না। হঠাৎ লয়লা একটু অন্যমনস্ক হলে রতন তার হাত চেপে ধরে পিস্তলটা কেড়ে নিল।

রতন বললে—এবার ?

—এবারে তুমি যা করবে তাই—কারণ তুমি জিতে গেছ।

কিন্তু কথা শেষ হলো না।

ঝোপের ভেতর থেকে একটা হাত বেরিয়ে এলো।

একটা লোহার রডের আঘাত পড়ল সোজা রতনের মাথায়।

রতন শব্দটুকুও করতে পারল না।

নিঃশব্দে জ্ঞান হারাল রতন।

রাত তখন বোধহয় সওয়া নটা বেজে গেছে।

রতনের জ্ঞানহীন দেহটা তারা গাড়িতে তুলে নিল।

আবার গাড়ি ছুটে চলল।

রতনের যখন বহুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরল তখন সে দেখে একটা ঘরে সে বন্দী হয়ে শুয়ে আছে।

ঘরটা অন্ধকার।

তখন দিন না রাত তাও ভাল করে বোঝা যায় না।

॥ নয় ॥

—একটি বন্দী

দীপক রতনের জন্যে খুবই চিন্তিতভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিল।

হঠাৎ তার মনের মধ্যে একটা চিন্তা দেখা দিল। রতন কি তবে বন্দী হলো সেই দলের অর্থাৎ আগন্তুকের হাতে।

ফোন তুলল দীপক।

যোগাযোগ করল লালবাজারের সঙ্গে।

—হ্যালো, কে ?

—আমি দীপক কথা বলছি।

—আমি মিঃ গুপ্ত।

—শুনুন, রতনের কোনও খোঁজ আমি এখনো পাইনি। তাই আমি খুবই চিন্তার মধ্যে আছি।

—শুনুন, রতনের একটা বিশেষ খবর আছে।

—কি খবর ?

—হোটেল স্পেনে রতন একটা মেয়ের সঙ্গে মেশে। তারপর ঐ মেয়েটি রতনকে নিয়ে যায় লেকের দিকে। তারপরে আর কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

—কি করে খবর পেলেন ?

—আমরা তার উপরে ওয়াচ রেখেছিলাম।

—বুঝেছি।

—আমাদের লোক তাকে ফলো করলেও শেষটুকু জানতে পারেনি।

—গাড়ির নম্বর জানেন ?

—তা জানি।

—কত ?

—WBK 123456।

—এটা ত তবে প্রফেসার হেসিং-এর গাড়ি।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু প্রফেসার হেসিং কোথায় ?

—তিনিও উধাও।

—কেন ?

—কারণ তিনি বোধহয় ঐ দলের কথা অমান্য করেছেন।

—তা হতে পারে।

—সব কিছু মিলিয়ে সত্যি একটা জটিল কাণ্ডকারখানা চলছে।

—তা ত দেখতেই পাচ্ছি। সত্যি খুব চিন্তিত আমি।

দীপক রিসিভার নামিয়ে রাখল।

তারপর পোশাক পরে সে বাইরে বের হতে যাবে, এমন সময় আবার ফোন বেজে উঠল ঘন ঘন।

—হ্যালো, কে ?

—আমি মিঃ গুপ্ত বলছি। শুনুন মিঃ চ্যাটার্জী, নতুন ঘটনা ঘটেছে।

—কি রকম ?

—একজন লোককে সন্দেহক্রমে ধরা গেছে অনেকদিন ফলো করে।

—কে সে ?

—মনে হয় আগন্তুকের দলের লোক সে।

—কি করে বুঝলেন ?

—তার অনেক কারণ আছে। আপনি আসুন এখানে।

—আচ্ছা, আমি ঠিক পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে আসছি।

—ও. কে.।

দীপক দেখল সার্জেণ্ট রহিম একজন লোককে ধরেছে।

একটি সুদর্শন যুবক। বয়স তার ত্রিশ-বত্রিশ হবে। পরনে স্যুট।

দীপক জেরা শুরু করে দিল।

—আপনার নাম ?

—নির্মল।

—কি করেন আপনি তা বলুন।

—কিছু না।

—কিছু না। তার মানে ?

—আমি কিছু জানি না।

—দেখুন নির্মলবাবু, আপনাকে যা যা প্রশ্ন করা হবে তার ঠিক উত্তর দিন।

---তা না দিলে ?

---আপনাকে সত্যি কথা বললে মুক্তি দেব। তা না হলে অকথ্য অত্যাচার চলবে।

---আমি কিছু জানি না।

—আপনি তাহলে জবাব দেবেন না ? ঠিক আছে। রহিম খাঁ!

রহিম খাঁ ছুটে এলো।

---লোকটির গালে দুটো কষে চড় লাগাও ত দেখি।

দুটো চড় খেয়েও লোকটা কিছু বলতে রাজী হলো না।

দীপক বললে—সত্যি কথা বলো নির্মল, তুমি কি করো ?

—কিছুই করি না।

দীপক বললে—নির্মল, কি কারণে তুমি কথা বলবে না আমি জানি। লাগাও কড়া ইলেকট্রিক চার্জ।

একবার, দুবার……

দুবার চার্জ লাগাতেই নির্মল বললে---বাঁচান আমাকে। আমি সব বলছি।

—সত্যি বলবে ত ?

—হ্যাঁ স্যার, সব বলব।

—তুমি কোথায় থাক ?

—৫২।৫।২, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড।

—সেটা কি বাড়ি ?

—না, গুদাম।

—কার কাছে কাজ কর তুমি বল ত ?

—আগন্তুকের কাছে।

—সে কে ?

—কোনও দিন তাকে দেখিনি। কেউ তাকে দেখতে পায় না।

—তবে আদেশ পাও কিভাবে ?

—আশ্চর্য এক ফোনে।

—টেলিফোন নম্বর ?

—আর জিজ্ঞাসা করবেন না। এর বেশি বললে আমাকে মরতে হবে।

—ভয় নেই—আমি ঠিক তোমাকে রক্ষা করব জেনো।

—নম্বর নেই। ফোনটা সাধারণ নয়—পৃথক ধরনের। এর অনেক এক্সটেনশন আছে। প্রত্যেকটি অনুচরের কাছে তার কানেকশন আছে।

—তোমার নম্বর কি ?

—জিরো ডবল নাইন। এটা আমার নিজেরও নম্বর।

—সেটা কি রকম ?

—আমাদের দলের প্রত্যেকের এমনি নম্বর থাকে। নাম থাকে না। যেমন—জিরো ডবল ওয়ান, জিরো ডবল ফোর ইত্যাদি।

—আচ্ছা, আগন্তুকের কোনও বিশেষ ঠিকানা জান ?

—আজ্ঞে, না।

—জানবার চেষ্টা কি কখনো করেছ ?

—মাথা খারাপ ! সে সাহস দলের কারও নেই।

—জোহরাকে চেনো ?

—আজ্ঞে, না।

—লয়লাকে ?

—না। আমাদের কেউ একজন অন্যজনকে চেনে না—যদি না কর্তা ইচ্ছা করে চিনিয়ে দেন।

—আর কিছু জান ?

—আজ্ঞে, না।

—আচ্ছা, বিশ্রাম কর। তোমার কোনও রকম ভয় নেই। আমি তোমাকে সব সময় রক্ষা করব।

—সে ভরসা হয় না স্যর।

—কেন ?

—আজ অবধি কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে বাঁচেনি।

—তা জানি। তবে এখন থেকে নিয়ম পাল্টে যাবে।

—দেখা যাক স্যার—সেটা নেহাৎ তাহলে আমার ভাগ্য।

দীপক আর কিছু না বলে বেরিয়ে চলে যায়।

॥ দশ ॥

—একটি নারীর মুক্তি

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল কে যেন হঠাৎ দরজা খুলে।

রতন তাকাল।

ও কে?

দেখল, যে প্রবেশ করল তার হাতে একটা উদ্যত পিস্তল। সে নারী।

—কে তুমি?

—আমি লয়লা।

—তুমি?

—হ্যাঁ। কোনও রকম চালাকি করার চেষ্টা করো না রতন।

—কেন?

—তা করলে এখান থেকে বের হতে পারবে না। কারণ, এখানে সব চলে কর্তার ইচ্ছামত।

—তোমার পিস্তলের ত প্রয়োজন নেই এখন লয়লা!

—কেন?

—তোমার চোখের তেজই যথেষ্ট।

—সাট্ আপ্! চুপ কর তুমি!

—তোমাকে কিন্তু রাগলে খুব ভাল দেখায় লয়লা।

—দেখ, তুমি আমাকে কথা দিয়ে এভাবে ভোলাবার চেষ্টা করো না।

—তাহলে কি করব?

—বাইরে চল। খাবার খেয়ে নাও।

—এ ত ভাল কথা।

—তারপর তোমাকে কর্তার সঙ্গে দেখা করতে হবে। বুঝলে?

—কে? ঐ আগন্তুক দস্যুর সঙ্গে?

—তোমার কোনও কথার উত্তর আমি দেবো না রতন। চলো সোজা এখান থেকে বাইরে।

বাইরে কিছুটা গিয়ে একটা সিঁড়ি। সেটা দিয়ে নেমে একটা সাজানো হলঘর।

রতন দেখল এ-বাড়িতে অনেক সুন্দর সুন্দর ঘর আছে। কিন্তু বের হবার কোনও পথ সে দেখতে পেল না।

আরও গিয়ে লয়লা বললে—যাও, ভেতরে যাও—এটা বাথরুম।

—এখানে?

—হ্যাঁ। ভাল কথা, পিস্তল সঙ্গে নেই ত?

—থাকলেই বা কি?

—না, কর্তার ভয় নেই। তবে আমি ত সঙ্গে আছি। হয়ত আমাকেই—

—ছিঃ! আমি অত নির্দয় নই।

স্নান করে বাথরুম থেকে বের হলো রতন। নতুন পোশাক তার জন্যে তৈরী ছিল।

তারপরে সে খেতে বসল। সঙ্গে সঙ্গে লয়লাও খেতে বসল।

খাওয়া হয়ে গেল। তারপর তারা এলো অন্য একটা ঘরে।

সে ঘরে অনেক চেয়ার পাতা ছিল। প্রতিটি চেয়ারে নম্বর লেখা ছিল। যেমন—জিরো ডবল ওয়ান, জিরো ডবল টু প্রভৃতি।

এমনি ত্রিশটা সিট ছিল। তবে সব সিট খালি।

একটাতে বসল লয়লা। তার পাশে বসল রতন। বললে—তা তামাদের কর্তা কোথায়?

লয়লা চুপ করে রইলো।

—তুমি কি বোবা?

—না।

—তাহলে কথা বলছো না কেন?

—এক্ষুণি দেখবে।

হঠাৎ সামনের একটা বড় আয়না খুব কাঁপতে লাগল। তারপর তার উপরে দেখা গেল একটা মুখোসধারীর আকৃতি ফুটে উঠেছে।

তারপর শোনা গেল কণ্ঠ—হ্যালো জিরো ডবল টু—

লয়লা বললে—বলুন।

—ও কি একাই ধরা পড়েছে?

—হ্যাঁ।

—দীপক ধরা পড়েনি?

—না। তবে আজ তাকে ধরার চেষ্টা করা হবে স্যার।

—না, তার দরকার হবে না।

—কেন স্যার?

—সে তার প্রিয় সঙ্গীকে খুঁজতে নিজেই আসবে এখানে দু' একদিনের মধ্যেই।

রতন বললে—তুমিই আগন্তুক?

—আগে ভাল করে কথা বলতে শেখো।

—তুমি রেগে গেছ?

—রাগব না? তুমি নয়—বল আপনি।

—আমি একমাত্র ভগবান ছাড়া কাউকে সম্মান করি না। বুঝলে আগন্তুক?

কথাটা বলে রতন হাসল মৃদু হাসি।

—তোমাকে কুকুরের মত গুলি করে মারা হবে তোমার বন্ধুর সঙ্গে। আগে সে ধরা পড়ুক, তারপর—

—তুমি বড় রেগে গেছ।

—বাজে কথা বন্ধ কর। তুমি দীপককে ফোনে ডাকতে পারবে?

—কেন?

—আমার ইচ্ছা।

—কি বলবো তাকে?

—তোমার যা খুশী।

—বেশ, ফোন করব। তবে তুমি এত বেশি ভীত কেন বলো ত?

—আমি ভীত নই।

—তবে সামনে না এসে পেছনে আছো কেন?

—সেটা আমার ইচ্ছা।

—এই শক্তি নিয়ে তুমি আমাদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে চাও?

—চুপ কর। দেখছো ত, কত সহজে তোমাকে বন্দী করেছি।

—তা ঠিক। তবে দীপককে এত সহজে ধরতে পারবে না।

—দেখতেই পাবে।

রতন আর কথা বললে না।

লয়লা বললে—চলো, এবারে ভেতরে যেতে হবে তোমাকে।

রতন উঠে দাঁড়াল।

* * *

রতনকে নিয়ে লয়লা একটা বন্ধ ঘরে চলে এলো।

লয়লা বললে—মিঃ রতন, এটা আপনার বিশ্রাম কক্ষ।

ঘরটি ছিল এয়ারকণ্ডিশান করা। রতন অবাক হলো ভূগর্ভে কি সুন্দর ঘর তৈরী করা হয়েছে তা দেখে।

রতন বললে—এবার থেকে তাহলে আর তোমাকে লয়লা বলে ডাকব না।

—তবে ?

—বলব—জিরো ডবল টু।

—তোমার যা খুশী।

রতন খাটে গা এলিয়ে দিল। একটু পরে লয়লা এলো এক গ্লাস সরবৎ হাতে নিয়ে।

রতন বললে—তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, তাই না ?

—কেন ?

—আমার জন্যে তোমাকে এত কাজ করতে হচ্ছে আজ।

—তাতে কি ?

সরবৎ খেলে রতন। বললে—এসো না, পাশে একটু বসো।

—কিন্তু—

—ভয় কি ? এ-বাড়ি থেকে বের হবার সাধ্য কারও নেই।

—তা ঠিক !

লয়লা পাশে বসল।

দু'জনে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করল।

তারপর লয়লা বললে—তোমাকে অনেক মেয়ে ভালবাসে। তাই না রতন ?

—তা বটে।

—তেমনি দু' একটা মেয়ের গল্প তুমি শোনাও না !

—শুনবে ?

—হ্যাঁ।

—তাহলে অল্পদিন আগেকার একটা গল্প বলছি, শোন।

—বেশ ত, বলো।

রতন তাকে জোহরার বিষয়ে কিছু কিছু কথা শোনাল।

লয়লাকে বললে—তাকে চেনো?

—না।

—কেন?

—আমাদের দলের কেউ অন্য কাউকে চেনে না।

—বুঝেছি। আচ্ছা লয়লা, আর একটু কাছে এসো না।

লয়লা বসল রতনের গা ঘেঁষে। রতন নানান্ গল্প করতে লাগল।

এক সময় লয়লার মন একটু অন্যমনস্ক হতেই রতন তাকে কি একটা জিনিস শুঁকিয়ে দিল।

মিষ্টি গন্ধ—লয়লার ভাল লাগল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে জ্ঞান হারাল।

* * *

লয়লা জ্ঞান হারাতেই রতন চট্ করে বেরিয়ে বাইরে এলো।

চারদিক অন্ধকার।

কিছুটা এগোল রতন। একটা সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে সে উপরে উঠল। কিন্তু চারদিক বন্ধ।

হঠাৎ দেখে দু'জন লোক বসে কথাবার্তা বলছে। রতনকে দেখে লোকটা বলে উঠল—তুমি কে?

—আমি জিরো ডবল সেভেন।

—এখানে কেন এসেছ?

—কর্তার হুকুমে এসেছিলাম।

—কি চাও?

—বাইরে যাবার পথটা দেখিয়ে দাও ত!

—তুমি কি নতুন?

—খুব নতুন নয়। তবে প্রথম প্রথম এমন হয়। মাত্র দু' একবার এসেছি ত!

—বেশ, চল।

লোক দু'টি নিঃসন্দেহে রতনকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে গেল। তারপর বললে—এবার চোখ বাঁধতে হবে।

—কেন, বলো ত?

—এটা নিয়ম তা জানো না?

—তা ত জানি। তবে না বাধলে ক্ষতি কি এমন?

—না, নিয়মমত চলতেই হবে।

রতনের চোখ বেঁধে তারা উপরে নিয়ে এলো। তারপর চলে গেল ভেতরে।

রতন দেখে একটা ঘরের দরজা বাইরের থেকে তালাবন্ধ।

কি ব্যাপার? রতনের কৌতূহল হলো।

সে দেখল হালকা তালা। সে জোরে চাপ দিতেই সেটা খুলে গেল।

রতন দরজা খুলে দেখে একটা মেয়ে শুয়ে আছে বিছানায়।

রতনকে দেখে সে বিস্মিতভাবে বলে উঠল—কে তুমি?

—চুপ!

রতন তার হাত ধরে বাইরে বেরিয়ে এলো। তারপর সোজা বাড়ি থেকে পড়ল পথে।

চারদিকে ঝোপ-জঙ্গল।

তার মধ্য দিয়ে দু'জনে চলতে লাগল।

রতন এবার বললে—আমি রতন। গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জীর সহকারী।

—ও! আপনি?

—হ্যাঁ। তুমি কে?

—আমি রমলা। শেঠ রামসিং-এর মেয়ে আমি।

—তোমার উপর কোনও অত্যাচার ওরা করেনি ত রমলা ?

—কক্ষনো না।

—ওরা লোক ভাল ?

—সত্যি ভাল। বোঝাই যায় না যে, ওরা এত বড় একটা ক্রিমিন্যাল।

—তা বটে।

জঙ্গল ভেদ করে অনেকটা চলার পর পথ পাওয়া গেল।

রতন দেখল একটা স্ট্যাণ্ডে ক'টা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।

রাত বেশি হয়নি—বোধহয় রাত দশটা হবে।

রতন একটা ট্যাক্সিতে চাপল রমলাকে সঙ্গে নিয়ে। তারপর বললে —সোজা চলো।

—কোথায় ?

—লালবাজার।

—আপনি কে ?

—পুলিশের আই-বি'র লোক।

—ঠিক আছে।

ট্যাক্সি ছুটে চলল।

॥ এগারো ॥

—আবার দুটি মৃত্যু

মিঃ গুপ্তের কাছে ঘন ঘন ফোন পেয়ে দীপক চলল লালবাজারে।

সেখানে গিয়ে সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল যেন।

দেখল রতন ফিরে এসেছে। শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে রমলা—সেও মুক্ত।

দীপক বললে—সাবাস রতন।

রতন সব বললে।

এমন সময় একজন পাহারাদার কনেস্টবল এসে বললে—স্যার, খারাপ খবর।

—কি হলো?

—দশ নম্বর সেলের বন্দী মারা গেছে।

—তার মানে?

—মানে রাতের খাবার খাওয়ার আগেও সে সুস্থ ছিল। খাবার পরই সে ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে। আমরা স্যার মনে করেছিলাম বোধহয় সে অভিনয় করছে। এখন দেখছি সে মারা গেছে।

—কে খাবার দিল?

—যে সবাইকে দেয়।

—তাহলে নিশ্চয় খাবার যেখান থেকে সাপ্লাই হয় সেখানে কেউ ছিল, যে—

সঙ্গে সঙ্গে দীপক গিয়ে তদন্ত করল।

শুনল খাবার দেবার সময় সেখানে একজন অচেনা কনস্টেবল ছিল। সে যে নতুন কাজ করছে জানা গেল।

দীপক বললে—তাকে খুঁজে বের করো।

অনেক খোঁজা হলো—কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না শেষ পর্যন্ত।

মিঃ গুপ্ত বললেন—ঐ সেলের বন্দীটা কে তা জানেন?

—না।

—সে হলো নির্মল।

দীপক রেগে গেল।

বললে—উঃ, তাকে বাঁচাব বলে আমি কথা দিয়েছিলাম।

—কিন্তু ব্যর্থ হলেন ত?

—তা ত দেখছি।

—তাহলেই বুঝুন কি রকম ক্ষমতা ওদের।

—তা ত দেখছি।

দীপক ফিরে এলো ঘরে। এমন সময় একজন লোক এলো। সে সার্জেণ্ট রহিম।

সে বললে—একটা খবর আছে স্যার।

—কি খবর?

—বিমান কলোনীর তেরো নম্বর বাড়ির সামনে একজন অচেনা লোককে খুবই সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে।

—সত্যি?

—হ্যাঁ।

—তারপর?

—তারপর একটা গাড়ি এসে দাঁড়ায়। কিছু মাল নামানো হয়। গাড়িটা চলে যায়।

দীপক লাফ দিয়ে উঠল। বললে—মিঃ গুপ্ত, চলুন সেখানে যাই।

—বেশ ত চলুন।

রমলাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। তারপর তারা যাত্রা করল বিমান কলোনী অভিমুখে।

* * *

রাত বারোটা বেজে গেছে।

অন্ধকার রাত।

বিমান কলোনী থেকে কিছু দূরে দাঁড়াল আগের সেই পুলিশ ভ্যান।

দীপক ও রহিম এগিয়ে চলল বাড়ির ভেতরের দিকে।

দীপক বলে গেল—মিঃ গুপ্ত, আপনি কিছুতেই নড়বেন না।

—আচ্ছা।

—খুব হুঁশিয়ার।

—ঠিক আছে।

—কাউকে পালাতে দেখলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে আট্‌কাবেন। না হলে তাকে গুলি করবেন।

—ও. কে.।

দীপকরা এগিয়ে গেল।

নির্দিষ্ট বাড়ির সামনে এসে দীপক দাঁড়ালো।

তাকাল সামনের দিকে তারা।

সারা বাড়ি অন্ধকার।

রহিম বললে—এখন কি করবেন স্যার বলুন ত?

—তাই ত ভাবছি।

—ভয় নেই, চলুন ভেতরে।

এমন সময়—

একটা আর্তনাদ শোনা গেল।

যেন মুমূর্ষু লোকের অন্তিম কাতর কান্না সেটা।

দীপক বললে—জল্‌দি চলো।

পিস্তল উদ্যত করে তারা এগিয়ে গেল ভেতরের দিকে।

সকলে সন্ত্রস্ত।

কিন্তু কোনও সাড়া মিলল না কারও।

হঠাৎ—

কিসে যেন পা লেগে হঠাৎ দীপক পড়ল হুমড়ি খেয়ে।

—দেখ ত কি?

রহিম টর্চ জ্বালল। একটা মানুষের দেহ।

দীপক তাকাল। মুণ্ডটা নেই, শুধু ধড়টা পড়ে। মুণ্ডটা কিছু দূরে।

তার উপরে টর্চ ফেলল দীপক।

দেখল সেটা প্রফেসার হেসিং-এর মৃতদেহ।

দীপক বললে—আবার হত্যা!

—তাই ত!

—বোধহয় ও বেইমানী করেছিল।

—তাই মনে হয়।

দীপক হুইসেলে ফুঁ দিল।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ বাহিনী এগিয়ে এলো সামনে। সারাটা বাড়ি তন্ন তন্ন করে সার্চ করা হলো।

কিন্তু কোনও মানুষের চিহ্ন মিলল না।

দীপক চিন্তিত হলো।

বললে—নিশ্চয় কোনও গুপ্তপথে আগেই পালিয়ে গেছে তারা।

—কিন্তু পথ কোথায়?

—তা জানি না। তবে হয়ত পেছনের দিকে পথ আছে। এদিকে কা জঙ্গল।

—তা হতে পারে বটে।

—এখন চলুন ফেরা যাক।

—হ্যাঁ।

—আর এই মৃতদেহটা পাঠিয়ে দিন লালবাজারে পুলিশ মর্গে।

—তা ত দেবোই। কিন্তু এটাও কি তবে সেই আগন্তুকের কাজ?

—নিশ্চয়।

—কি করে জানলেন?

কারণ প্রফেসার হেসিং ওদের দলে ছিল তা জানতাম। হয়তো আদেশ অমান্য করেছে, তাই এই শাস্তি।

—তা হতে পারে।

দীপক আর কোনও কথা বললে না।

॥ বারো ॥

— আগন্তুকের আরও কীর্তি

পর পর কোলকাতা শহরের বুকে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটল, যা সারা কোলকাতা শহরকে চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন করে তুলল।

প্রতিটি লোক বিস্মিত।

পুলিশ বিভাগ স্তম্ভিত।

সকলের মুখে শুধু একটিমাত্র প্রশ্ন—এসব কার কীর্তি? কে এভাবে দিনের পর দিন আইন অমান্য করতে পারে?

পর পর বহুবার বহু জায়গায় বোমা মেরে বা ছোরা দেখিয়ে হাজার হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়েছে। কয়েক জায়গায় পুলিশ বাধা দিয়েছে। কিন্তু বাধা দিয়েও কোনও ফল হয়নি। পুলিশের কয়েকজন সাধারণ কর্মচারী বা বড় বড় অফিসার ছোরাবিদ্ধ হয়েছে।

কাগজে কাগজে সে সব খবর ছাপাও হয়েছে।

অবশেষে পুলিশ বিভাগ একদিন জানতে পারল যে, এ সবকিছুর মূল ঐ দস্যুদল—যার নাম তারা চিহ্নিত করেছে আগন্তুক বলে।

অবশেষে একদিন কাগজে ছাপা হলো—

আগন্তুকের নবতম কীর্তি!

তিনটি বড় বড় ব্যাঙ্ক লুঠ!

দিনের পর দিন আতংক বৃদ্ধি! পুলিশী ব্যর্থতা!

তার নিচে ছাপা হয়েছিল :

কোলকাতা শহরের বর্তমান অবস্থা দেখে মনে হয় যে, তা যেন একটি অরাজক শহরে পরিণত হয়েছে। যেখানে সেখানে লুঠ চলছে। কথায় কথায় বোমা আর ছোরা। তারপর এই শহরেই তিনটি বড় বড় ব্যাঙ্ক প্রকাশ্য দিবালোকে লুঠ হলো। এসব যে কার কীর্তি তা পুলিশ বিভাগ প্রকাশ করতে চায় না। কিন্তু আমরা জানি যে, এসবই হলো দস্যু আগন্তুকের কীর্তি।

কিন্তু একটা কথা—

কেন আগন্তুক এভাবে সফল হতে সমর্থ হলো, কেনই বা পুলিশ ব্যর্থ হলো তাদের ধরতে তা আমরা জানি না। তবে একথা ঠিক যে, অবিলম্বে এই দলটি ধরা না পড়লে সাধারণ মানুষের বিরাট অবিশ্বাস জাগবে পুলিশ বিভাগের প্রতি।

তার উত্তরে পুলিশ বিভাগ থেকে যে 'নোট' দেওয়া হলো, তাও প্রতিটি কাগজে ছাপা হলো। পুলিশ বিভাগ জানাল যে, তাদের অনেক লোক যত্র-তত্র খুন হচ্ছে। পুলিশকে ছোরা মারা হচ্ছে যেখানে সেখানে। এই সব গুণ্ডার দল চায় পুলিশের মনে একটা ভয়—একটা ত্রাসের সঞ্চার করতে। তাহলে তারা কর্তব্যবিমুখ হবে তখন এদের কাজ চলবে অবাধ গতিতে।

তাই পুলিশ বিভাগেরও খুব বেশি দোষ দেওয়া চলে না। একথা ঠিক যে, পুলিশ বিভাগ অনেক সময় জনসাধারণের উপরে অত্যাচার করে। তবে তারা তা করে লোকের মনের খবর বের করার জন্যেই—তা না হলে আগন্তুককে ধরা যাবে না।

কিন্তু দস্যু আগন্তুক এই সুযোগে পুলিশের উপরে অন্যায় জুলুম ও হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে তাদের কর্মধারা বন্ধ করতে চায়।

আমাদের একমাত্র ভরসা এই যে, ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী একাজে

হাত দিয়েছেন। তবে তিনি যে কতটা সফল হবেন তাও আমরা জানি না।

এইখানেই কাগজের ভাষা শেষ। কিন্তু তাতে খুব বেশি সন্তুষ্ট হলো না জনসাধারণ। তারা চায় একটিমাত্র ঘটনা—তা হলো, আগন্তুক গ্রেপ্তার হোক।

এদিকে পুলিশ বিভাগও একেবারে চুপ করে ছিল না। তারাও প্রাণ-পণে চেষ্টা করে চলেছিল আগন্তুককে গ্রেপ্তার করতে। তাই সেদিন সকালে পুলিশের মাথাওয়ালা সকলে একটা গোপন মিটিং আহ্বান করেছিলেন।

* * *

লালবাজার পুলিশ হেড কোয়ার্টার।

সেদিন সকালে সেখানে যে গোপন মিটিং শুরু হয়েছিল তাতে অনেকেই যোগ দিয়েছিলেন।

লোক বেশি ছিলেন না। তবে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই উঁচুদরের পুলিশ অফিসার।

পুলিশ কমিশনার মিঃ মুখার্জী, ইন্‌স্পেক্টার মিঃ সেন, মিঃ গুপ্ত, মিঃ বাজপেয়ী, মিঃ তালুকদার থেকে সকলেই উপস্থিত ছিলেন সেই মিটিংয়ে।

পুলিশ কমিশনার প্রথমে কথা শুরু করলেন। তিনি ধীর কণ্ঠে বললেন—আমাদের পুলিশ বিভাগ খুব শিক্ষিত ও যথেষ্ট কার্যকরী ক্ষমতা-সম্পন্ন। তা সত্ত্বেও আমরা আজ আগন্তুকের প্রতিটি কাজের জন্যে তার কাছে হেরে যাচ্ছি। জানি না, আপনারা একে ঠিক কিভাবে গ্রহণ করবেন। তবে এটা ঠিক যে, পুলিশ বিভাগ আজ হয়ে উঠেছে সন্ত্রস্ত ও বিপর্যস্ত। আমরা চাই এর একটা সমাধান। তবে তাও কিছু করতে পারছি না। এর কারণ কি?

মিঃ সেন বললেন—আমরা সত্যিই পরিশ্রমের ত্রুটি করছি না। তা সত্ত্বেও কেন যে আগন্তুক নামধারী এই দলটা আমাদের বিভ্রান্ত করছে, আমাদের সব কর্মক্ষমতাকে ব্যর্থ করছে তা জানি না।

মিঃ বাজপেয়ী বললেন—তবে একটা কথা সত্যি স্যার—তা হলো দীপকবাবু প্রতিটি পদে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলেছেন এই সমস্যার সমাধান করতে। তিনি যে কেন ব্যর্থ হচ্ছেন, তা জানি না।

পুলিশ কমিশনার মিঃ মুখার্জী বললেন—সব কিছুর দায়িত্বই যে দীপকবাবুর উপরে চাপিয়ে দিতে হবে তার মানে নেই। তাহলে আমরা কি করছি? কি আমাদের ক্ষমতা?

মিঃ বাজপেয়ী বললেন—তাহলে আপনারা কি কাজ চান, তা বলুন।

—আমি চাই যে, অবিলম্বে এতে আমরা যেন সফলতা অর্জন করি।

—কিন্তু তা যে কতটা কঠিন তা ত জানেন, স্যার। সব জায়গায় পুলিশ পরাজিত ও পর্যুদস্ত হচ্ছে।

—তা ঠিক। তবু—

কথা শেষ হয় না। হঠাৎ ক্রিং ক্রিং শব্দে বেজে ওঠে টেলিফোন।

টেলিফোনের রিসিভার তোলেন পুলিশ কমিশনার স্বয়ং। বললেন—হ্যালো, কে?

—আমি আগন্তুকের দলপতি বলছি।

—আপনি—মানে তুমি হঠাৎ—

—কি হলো? ঘাবড়ে গেলেন নাকি?

—না, তা নয়।

—তবে?

—আমি দেখছি তোমরা কতটা ভয়ংকর ও দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছো।

—তা ত হয়েছি। তাকে আপনি বন্ধ করবেন কি করে? আপনি কি পারবেন আপনার দল নিয়ে আমাদের সঙ্গে লড়াই করতে?

—চেষ্টা করবো নিশ্চয়।

—তাহলে আপনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবেন। পুলিশ বিভাগের কোনও সাধ্য নেই, আমাদের এতটুকুও ক্ষতি করতে পারে।

—তার মানে?

—মানে অতি সহজ। জেনে রাখুন, আপনাদের প্রতিটি পদে আমাদের লোক অনুসরণ করছে। ব্যর্থ হতে আপনারা বাধ্য।

—কি সব যা তা বলছো!

—বেশি কিছু নয়। আমি যা বললাম তা বসে বসে ভাবুন। আপনাদের ভরসা দীপক ও রতন। কিন্তু তারা পর্যন্ত আমাদের কাছে পরাজিত হতে বাধ্য।

—তোমার সাহস খুব বেশি।

—তা যা বলুন ক্ষতি নেই। আচ্ছা—

ফোন কানেকশন কেটে গেল। আর কোনও শব্দ নেই।

পুলিশ কমিশনার ফোন রেখে দিলেন। তাঁর দুটি চোখে দেখা গেল ব্যর্থতার ছায়া।

তেরো

—লয়লার নবরূপ

বহুক্ষণ জ্ঞানহীন হয়ে পড়েছিল লয়লা।

হঠাৎ সে জ্ঞান ফিরে পেল।

লয়লা তাকাল। চোখমুখ মুছল। তারপর তাকিয়ে দেখতে পেল দেওয়াল ঘড়িতে রাত দশটা বেজে গেছে।

রতন কোথায় ?

লয়লা দ্রুত পায়ে বের হলো ঘর থেকে। যাকে পেল, প্রশ্ন করল—একজন বন্দী ছিল আমার হেফাজতে। সে কোথায় ?

অবশেষে একজন জানাল যে, দলের লোক সেজে একজন লোক চলে গেছে।

লয়লা বুঝতে পারল যে, রতন ভাঁওতা দিয়ে চলে গেছে।

লয়লা প্রশ্ন করল—কতক্ষণ গেছে ?

—প্রায় আধঘণ্টা। সেই সঙ্গে একতলার বন্দী মেয়েটাও নেই।

—সেকি !

—সত্যি কথাই বলছি।

—তাহলে সে নিশ্চয় এতক্ষণ বহুদূরে চলে গেছে। আর ধরা যাবে না তাকে।

লয়লার সারা মন ভয়ে শিউরে উঠল।

সে উপরে উঠে এলো।

এমন সময়—

ক্রিং ক্রিং ক্রিং—

বিচিত্র শব্দে ফোন বেজে উঠল।

লয়লা ফোন তুলল।

—কে ?

—আমি বলছি, আগন্তুক। তুমিই ত জিরো ডবল টু ?

—হ্যাঁ।

—বন্দীর খবর কি ?

—সে আমাকে অজ্ঞান ক'রে দিয়ে পালিয়ে গেছে।

—আমি তা টের পেয়েছি। কিন্তু তোমার কাছে এরকম আশা করিনি।

লয়লার হাত থেকে রিসিভার খসে পড়ে যাবার উপক্রম হলো। সে বললে—আমি কি করতে পারি বলুন ?

—শোন একটা কথা।

—বলুন, স্যার।

—তুমি চার নম্বর ঘরে চলে এসো।

—আচ্ছা, স্যার।

লয়লা কাঁপতে কাঁপতে গেল চার নম্বর ঘরের দিকে।

সেখানে গিয়ে দেখতে পেল কেউ নেই। ঘর ফাঁকা।

একটু পরে। ধীরে ধীরে এক মুখোসধারী আবির্ভূত হলো।

—লয়লা, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি কতটা তা জানো ?

—জানি, স্যার।

—তাহলে বন্দী পালালো কি ক'রে তা সব খুলে বলো।

—আমার নাকে কি যেন চেপে ধরে আমাকে অজ্ঞান করে ফেলেছিল।

—তারপর ?

—তারপর আমি জ্ঞান ফিরে পেতে দেখি সে সবাইকে ভাঁওতা পালিয়ে গেছে।

—তোমার এ অপরাধের শাস্তি কি জানো ?

—জানি।

—হ্যাঁ, দণ্ড তোমাকে পেতে হবে। তবে এক শর্তে ক্ষমা করতে পারি।

—বলুন।

—আজই তুমি দীপকের বাড়িতে গিয়ে রতনকে গুলি করে মারবে।

—গুলি করে মারব ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু আমি ত জীবনে কাউকে খুন করিনি।

—তা করনি। তবে আজ করতে হবে। কারণ দলের প্রয়োজন।

—আমি তা পারব না।

—তাহলে তুমি অবাধ্য হচ্ছ ?

—না, তবে...

—বুঝেছি। তুমি ঐ ছোকরাকে খুব ভালবাস ?

—তা নয়। আমি পারব না কাউকে খুন করতে।

—লয়লা !

মুখোসধারী তাকে একদৃষ্টে দেখতে লাগল।

ধীরে ধীরে লয়লার শরীরে যেন বিদ্যুৎ-প্রবাহ খেলে গেল।

—লয়লা !

—বল।

—তুমি কাকে ভালবাস ?

—শুধু তোমাকে—আর কাউকে নয়।

—তবে পারবে না তাকে শেষ করতে ?

—বেশ, তাই করব।

—তবে যাও। এই নাও পিস্তল। গাড়ি তৈরী আছে।

— তুমি কোথায় থাকবে ?

—হোটেল ডি কাফের মাটির নিচের ছোট কক্ষে।

—কেন ?

—কারণ এ জায়গা নিরাপদ নয়। রতন এখান থেকেই পালিয়েছে। এখানে রেড্ হতে পারে।

—তা বটে।

—তাই তুমি আমাকে ওখানে পাবে। আচ্ছা যাও। গুড নাইট!

—গুড নাইট!

বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। লয়লা তাতে চেপে বসে।

গাড়ি দ্রুত ছুটে চলে।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে থাকে লয়লার মনটিও।

॥ চৌদ্দ ॥

—মুখোমুখি

দীপকের বাড়ি।

দীপক বাড়িতে ছিল না। হরিধন গেছিল তার বাড়িতে। বাড়িতে একা ছিল রতন।

এমন সময়—

একটা গাড়ি এসে থামল বাড়ির সামনে।

রতন তাকাল।

গাড়ি থেকে নামল অবগুণ্ঠনবতী একটি মেয়ে।

রতনের সন্দেহ হলো। সে তার শোবার ঘরে একটা বড় বালিশ ঠিক মানুষের মতই সাজিয়ে রেখে দিল। তারপর নিজে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে রইল।

অবগুণ্ঠনবতী দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

কলিং বেল বাজল।

ভজহরি দরজা খুলে দিল।

—কাকে চান?

—দীপকবাবু আছেন? নারীকণ্ঠের প্রশ্ন।

—না।

—কে আছেন?

—রতনবাবু।

—কোথায়?

—ঘরে ঘুমিয়েছেন শ্রান্ত হয়ে।

—চল ত দেখি তিনি কেমন আছেন।

—চলুন।

ভজহরি রতনের শিক্ষামত লয়লাকে নিয়ে গেল শয়নকক্ষে।

তারপর সে নিজে বেরিয়ে এলো বাইরে।

রতনের ঘরে ঢুকেই রতনকে শায়িত দেখে সে গুলি ছুঁড়ল পিস্তল বের করে।

একবার, দুবার, তিনবার—

বাতাস কেঁপে উঠল গুলির শব্দে।

এমন সময়—

হঠাৎ পেছনে থেকে কে যেন তার পিস্তল কেড়ে নিল।

—কে তুমি?

—আমিই রতন।

—তুমি বেঁচে আছ?

—হ্যাঁ। এখন তুমি আমার বন্দিনী।

—জান গাড়িতে আছে জিরো ডবল নাইন?

—সে এতক্ষণ ভজহরির হাতে ধরা পড়ে গেছে।

সত্যই তাই।—

ভজহরি জিরো ডবল নাইন নম্বরধারী ড্রাইভারের হাত পিছমোড়া করে বেঁধে তাকে নিয়ে এলো।

—লয়লা! রতন ডাক দিল।

—বল।

—তুমি জান না আগন্তুকের দিন শেষ হয়েছে। এবার সে ধরা পড়বেই।

—না—না, এ আমি বিশ্বাস করি না।

—তবু তা সত্য। এখন বল ত সে আছে কোথায়? গুপ্ত আড্ডা থেকে নিশ্চয় সে পালিয়ে গেছে?

—নি না।

এমন সময়—

ঘরে প্রবেশ করল দীপক। বললে—আমিও বাড়িতে এসে গেছি লয়লা!

—আপনি কে?

—আমিই দীপক চ্যাটার্জী।

—ও। তবে শুনুন। আমার প্রাণের দায়িত্ব নিতে পারবেন?

—নিশ্চয়। আর ভুল হবে না। তোমাদের কোয়ার্টার এখন পুলিশের জিম্মায়। তুমি যদি সব কথা বল ত তোমাকে রাজসাক্ষী করে নেবো। তুমি ক্ষমা পাবে।

—ঠিক কথা ত?

—নিশ্চয়।

—তবে শুনুন। আমি জানি সে আছে সেই হোটেল ডি কাফের মাটির নিচের কক্ষে।

—তা আমিও আন্দাজ করেছি। যাক্, তুমি বিশ্রাম কর। রতন, ভজহরি আর আধ ডজন আর্মড পুলিশ এই বাড়ি গার্ড দেবে।

লয়লা বসে পড়ল। ভেঙে পড়ল কান্নায়।

রতন তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

* * *

বিরাট পুলিশ বাহিনী গিয়ে ঘিরে ফেলল হোটেল ডি কাফে।

পুলিশ বাহিনী সহ মিঃ গুপ্ত হোটেল ঘিরে ফেললেন।

প্রতিটি ঘর তন্ন তন্ন করে তল্লাসী করা হলো। যাকে সন্দেহ হলো তাকেই গ্রেপ্তার করা হতে লাগল।

অবশেষে সব ঘর সার্চ শেষ হলো। তবু পাওয়া গেল না আগন্তুকের সন্ধান। তখন দীপক অনেক খোঁজ করে করে অবশেষে একটা বাথরুমে গিয়ে পেলো একটা অদ্ভুত সুইচের সন্ধান।

দীপক সুইচটা টিপল। সঙ্গে সঙ্গে একটা দেওয়াল সরে গেল। দেখা গেল দেওয়ালের গায়ে একটা গহ্বর। গহ্বরটা দিয়ে নিচে নামতে লাগল বিরাট পুলিশ বাহিনী। প্রত্যেকের হাতে পিস্তল উদ্যত করা আছে।

গহ্বরের শেষে একটা কক্ষ। সেখানে বসেছিল একজন মুখোসধারী।

—হ্যাণ্ডস্ আপ্! হাঁকলেন মিঃ গুপ্ত।

—কে আপনারা?

—আমরা পুলিশ।

—তা জানি। তবে ভুল করেছেন এখানে এসে।

—তার মানে?

—মানে আমি একটু আগেই সব দেখে বিষ খেয়েছি। আর মাত্র কয়েক মিনিট আমার আয়ু।

ঢলে পড়ল মুখোসধারী আগন্তুক।

দীপক এগিয়ে গেল। ভাল করে পাল্‌স্ দেখল।

ধীরে ধীরে দীপক বললে—না, আর কোন আশা নেই।

—তার মানে?

—মানে, হি ইজ্ ডেড।

তখন মিঃ গুপ্ত মুখোসধারীর মুখোসটা খুলে ফেলল।

বললে—একি! এ যে এই হোটেলের ম্যানেজার মিঃ জোন্স।

দীপক ধীর কণ্ঠে বললে—আমি জানতাম যে, মিঃ জোন্সই আগন্তুক।

—সমাপ্ত—

পাতায় পাতায় আতঙ্ক, চক্রান্ত, রহস্য, রুদ্ধশ্বাসকারী ঘটনাচক্র, পড়তে পড়তে শিউরে উঠতে হবে।

ড্রাগন সিরিজ

শ্রীস্বপনকুমার রচিত। প্রতিটি ৭০ পয়সা

১। ড্রাগনের আবির্ভাব
২। রক্তলোলুপ ড্রাগন
৩। আকাশ পথে ড্রাগন
৪। ছদ্মবেশী ড্রাগন
। ফাঁসির মঞ্চে ড্রাগন
। অজানা দ্বীপে ড্রাগন
৭। সাগরতলে ড্রাগন
৮। মরণজয়ী ড্রাগন
৯। আন্তর্জাতিক চক্রে ড্রাগন
১০। মহাশূন্যে ড্রাগন
১১। পাতাল পুরীতে ড্রাগন
১২। ড্রাগন ও দস্যুনেত্রী চপলা

এর পরে আরও বের হতে থাকবে

র প্রকাশিত আর একটি আকর্ষণীয় রহস্য উপন্যাস গ্রন্থমালা

'ক্রাইম ওয়ার্লড্ সিরিজ'

ন্যাসিক শ্রীস্বপনকুমার রচিত। প্রতিটি ১'০০

৬। বিচারক
৭। ন্যায়দণ্ড
৮। অন্তরাল
৯। কার পাপে?
। আগন্তুক

বের হতে থাকবে